শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা

জ্যোতির্ময় বসু

স্বপ্নদীপ
৭/ই শীতলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৯৩৯

প্রচ্ছদপট
অংকন—পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রসেস

স্বপ্নদীপের পক্ষে মিতা সাহা কর্তৃক ৭/ই শীতলা লেন কলকাতা-৭০০০০৫
থেকে প্রকাশিত এবং অজিতকুমার ঘোষ কর্তৃক বাসন্তী প্রেস
৩৭ বিডন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

আমার সহধর্মিণী সাবিত্রী-সমা

৺ইলাকে—

যার অতুলনীয় প্রীতি, স্নেহ, সেবা ও সহিষ্ণুতার
কথা সদাসর্বদা স্মরণে রয়েছে।

বিষয় সূচী

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা

পূর্বকথা

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি দেরে গ্রামে। তিনি সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, কুলীন ব্রাহ্মণ, মধ্যবিত্ত সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর গৃহদেবতা রঘুবীর। এঁর বড় ছেলে ক্ষুদিরাম, পিতার মতই নিষ্ঠাবান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই, অগত্যা দ্বিতীয়া গৃহিণী হয়ে এলেন চন্দ্রমণি, তখন তিনি আট বছরের বালিকা, ক্ষুদিরাম পঁচিশ বছর বয়সের যুবক। বিবাহের ছ' বছর পর প্রথম সন্তান হল রামকুমার, তার পাঁচ বছর পর প্রথমা কন্যা কাত্যায়নীর জন্ম।

ঐ গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়—দৌরাত্ম্যই যার মাহাত্ম্য, একদিন তলব করলেন ক্ষুদিরামকে এক মিথ্যা মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য, কারণ সত্যবাদী ক্ষুদিরামের জবানবন্দীর দাম আছে। সব ব্যাপারটা শুনে ক্ষুদিরাম বললেন, 'মিথ্যা মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' ফল হল জমিদারই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে তাঁকে গৃহহারা করে ছাড়লেন। ক্ষুদিরামের স্থাবর অস্থাবর সব নিলাম হয়ে গেল। যাবেই তো—'যার পক্ষে আমলা, তার পক্ষেই মামলা।' ঐ দুঃসময়ে পুরানো বন্ধু কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী এগিয়ে এলেন। তাঁরই আগ্রহে ক্ষুদিরাম সপরিবারে এলেন কামারপুকুরে। বন্ধু দিলেন তাঁর বসতবাড়ির একাংশে থাকবার অধিকার, আর এক বিঘা দশ ছটাক ধানী-জমি, লক্ষ্মীজলায়।

একদিন গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ফেরার সময় এক গাছতলায় বসে বিশ্রাম নেবার সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে স্বপ্ন দেখেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশ ধরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'নিয়ে চল আমাকে।' ক্ষুদিরাম বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?' রামচন্দ্র বললেন, 'যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার

আমি ত্রুটি ধরি নে।' চারিদিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একটি শালগ্রাম শিলা যার উপর একটি বিষধর সর্প ফণা মেলে আছে। 'জয় রঘুবীর' বলে যখন তিনি শালগ্রাম শিলাটি সংগ্রহ করতে গেলেন তখন কোথায় সর্প! সেই শিলাটি তুলে ক্ষুদিরাম ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। রঘুবীরের পাশে রামচন্দ্র স্বয়মাগত গৃহদেবতা। এর পর সেতুবন্ধ রামেশ্বর ঘুরে নিয়ে এলেন বানলিঙ্গ শিব। হরির পাশে হর, সীতাপতির পাশে উমাপতি অবস্থিত হলেন।

এর প্রায় ষোলো বছর পর এঁদের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করল, নামকরণ হল রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার তখনই যজমানবাড়ি যাতায়াত করছেন। একদিন তার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে মা চন্দ্রমণি খুঁজতে বেরোবেন ভাবছেন, এমন সময় পরমাসুন্দরী সালঙ্কারা এক কন্যা এসে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, এখুনই ফিরবে।' বলেই মিলিয়ে গেল সেই দেবকন্যা। তাঁকে আর দেখা গেল না। ক্ষুদিরাম সব শুনে বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ।' পিতা-মাতা দুইজনেই দিব্যভাবের ভাবুক।

গদাধরের জন্ম

সেটা ১২৪১ সালের শীতকাল। ক্ষুদিরাম গয়ায় গেলেন তাঁর কন্যা কাত্যায়নীর উপর ভর করেছে যে এক দুষ্ট প্রেতাত্মা, তার উদ্ধার করতে। কিন্তু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে হবে। সেখানে রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। গদাধর তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'

এর পর বাড়ি ফিরে এসে শোনেন আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। যুগীদের শিবমন্দিরে গিয়েছিলেন চন্দ্রমণি, সঙ্গে ছিল ধনী কামারনী। হঠাৎ চন্দ্রমণি দেখতে পেলেন মহাদেবের দেহ থেকে একটি আলো প্রবল বেগে এসে তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। তিনি টলেই পড়ে যেতেন, যদি ধনী না তাঁকে ধরে ফেলত। 'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে'—চন্দ্রমণি

বলছেন স্বামীকে। স্বামী শুনে বললেন, 'গদাধর আসছেন তোমার গর্ভে।' নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনও বলেন, 'আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি।' কখনও বলেন, 'আমার মধ্যে পুরুষোত্তম আসছেন।' এমনই দিব্যোন্মাদনা গর্ভসঞ্চার-কালে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের জনকজননীর, বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর, খৃষ্টজননী মাতা মেরীর, শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবীর। শঙ্করের জননী অনুভব করেছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্য-দর্শন ও বরলাভেই শঙ্করের জন্ম।

চন্দ্রমণির স্বপ্নে দেখা সেই সন্তানের আবির্ভাব ৬ ফাল্গুন, ১২৪২, (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৬) শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্তে। ধনী কামারনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে। কিন্তু সে ছেলে কই? সে তো পিছল মাটিতে গড়াতে গড়াতে ধানসিদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে বিভূতি মেখে শুয়ে আছে। আলগোছে ধনী শিশুটিকে তুলে নিয়ে এল—ছাই মাখা ছেলে—ভাস্বর ভস্মভূষণ। গদাধরের জন্ম ঢেঁকিশালে, শ্রীচৈতন্যের জন্ম নিমগাছের নিচে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম পিটুলিগাছের নিচে। আর যীশুখৃষ্টের ঘোড়ার আস্তাবলে।

গদাধরের বাল্যজীবন

পাঁচ মাসের শিশুকে মশারি ঢাকা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে চন্দ্রমণি গৃহান্তরে গেছেন। কিছু পরেই ফিরে এসে দেখেন সেখানে ছেলে নেই, সেই শয্যায় শুয়ে আছে মশারি-প্রমাণ এক দীর্ঘকায় পুরুষ। চন্দ্রমণি চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'ওগো দেখে যাও—বিছানায় ছেলে নেই।' দ্রুত ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু দুজনেই তখন মশারির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেই ছোট্ট শিশুটিই অঘোরে ঘুমোচ্ছে! ক্ষুদিরাম বললেন, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশু, তার অন্নপ্রাশন দিতে হবে. সামান্য ভাবে। তা কি হয়! সকলের নয়নের মণি গদাধরের মুখেভাত ধুমধাম করেই হবে। এগিয়ে এলেন বন্ধু ধর্মদাস লাহা—টাকার থলির মুখ খুলে দিলেন। আড়ম্বরেই অন্নপ্রাশন হল।

গয়াধামে গিয়ে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত শিশুর নাম হল গদাধর। ডাকনাম গদাই।

গদাই বড় হয়ে উঠছে। প্রতিবেশী রমণীকুলের পরম আদরের ধন। চন্দ্রমণি সখ করে ধুতি পরিয়ে সাজান এই আত্মভোলা শিশুটিকে। শিশু ভোলানাথ। একদিন সে ফিরে এল কৌপীন পরে, ধুতি ছিঁড়ে কৌপীন হয়েছে। গদাধর বললে মাকে— 'সাধুরা আমায় কেমন সাজিয়ে দিয়েছেন দেখ মা!' মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। লাহাবাবুদের বাড়িতে যেসব সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হত তারাই তো গদাধরের খেলার সাথী! অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের এইটুকু বস্ত্রখণ্ডই যথেষ্ট!

পাঁচ বছরের গদাধর লাহাবাবুদের নাটমন্দিরের পাঠশালায় যায় পড়তে। কিন্তু পড়া এগোয় কই? অঙ্কের যদিও বা যোগটুকু হল, বিয়োগ আর মাথায় ঢোকে না। বিয়োগ কিছুতেই আরম্ভ করতে পারল না। হবে কি করে? পরম যোগীবরের কাছে আবার বিয়োগ কি? কোথায়ও বিয়োগ বিচ্ছেদ নেই, লয় ক্ষয় নেই। এখানে সবই পূর্ণ, পূর্ণ কখনও চূর্ণ হয় না, পূর্ণ বিয়োগের পরও বিয়োগফল পূর্ণ!

বালকের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ক্ষুদিরামের নজরে পড়েছিল। তিনি যখন বালককে কোলে করে নিজ পূর্বপুরুষদের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি অথবা রামায়ণ মহাভারত থেকে কোনও বিচিত্র উপাখ্যান শোনাতেন। একবার মাত্র শুনেই বালক অধিকাংশ আয়ত্ত করে ফেলত। কাজেই তিনি গণিতের শিক্ষার উপর তেমন চাপ দিতেন না। বালক সেই সময় প্রতিমা গঠন, দেবচিত্রাদি লিখন, অপরের হাবভাব অনুকরণ, সংকীর্ত্তন, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শুনে আয়ত্তীকরণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভা আহরণেই আনন্দ পেত। একবার মাত্র যাত্রাদি শুনে তার সমস্ত অংক আয়ত্ত করে, সে বয়স্যগণের মাঝে আম্রকাননে পুনরাভিনয় ক'রে দেখাতে পারত। আর তার ভাল লাগে মায়ের কাজের সাহায্য করতে, বিশেষ করে দেবসেবার কাজে।

বাল্যসমাধি

বালকটি অল্প বয়স থেকেই যেমন অসামান্য প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে, তেমনি তার যে ভাবের জগতেও আনাগোনা করতে হবে পরবর্তী-জীবনে তারও ইঙ্গিত রেখেছে সেই সময়েই তার বাল্য-সমাধির মাধ্যমে। সমাধি কাকে বলে? সমাধি পাঁচ রকম—পিপীলিকা, মৎস্য, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিরশির করে, কখনও আত্মা মাছের মত ভাবসমুদ্রে সন্তরণ করে, কখনও বাঁদরের মত লম্ফঝম্ফ দিয়ে মহাবায়ু উঠে যায় সহস্রারে। তারপর পাখীও মহাবায়ু হয়—এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বেড়ায়, মন তারপর উঠে যায় মাথায়। তির্যকও প্রায় তাই। তার লক্ষ্য মাথা। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। আর শেষ সমাধি হচ্ছে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ। আর এক রকম সমাধি আছে যাকে বলা হয় উন্মনা সমাধি, ছড়ানো মন হঠাৎ মুড়িয়ে আনা, উন্মনা হতে হতে স্থিতসমাধি হয়ে যাওয়া। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ হলেই স্থিত সমাধি, তখন সব সময়ই বাহ্য-জ্ঞানশূন্য।

ছ বছরের ছেলে ধানক্ষেতের সরু আল বেয়ে চলেছে কেমন আনমনা হয়ে। হঠাৎ কি মনে হল আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কালো মেঘের কোল ঘেঁষে পাখা মেলে উড়ে চলেছে সাদা সাদা বকের দল। সেই শোভা দেখে গদাই সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মনে হল কৃষ্ণতার সঙ্গে শুভ্রতার এই যে যোগাযোগ, এ দিব্যশোভা কে রচনা করল! কে এই কাব্যের কবি? কে তাকে ঘরে কুড়িয়ে নিয়ে এল কে জানে! এই গদাই-এর প্রথম সমাধি।

দুবছর পরে গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে বিশালাক্ষীর থানে পুজা দিতে যাচ্ছে ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে গদাই তার সাথী হল, বলে 'আমিও যাব'। প্রসন্ন খুশি হয়ে চলেছে তাকে নিয়ে। গদাই চলেছে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে সেই সব সুমধুর ভগবৎ-সঙ্গীত যা সে

শিখেছে শুনে শুনে, শেখা নয়। হঠাৎ তার শরীর অসাড় হয়ে গেল, দু চোখ ভরে গেল জলে। এই তার দ্বিতীয় সমাধি। তার কর্ণমূলে শোনালে ঈশ্বরের নাম, সে আবার সম্বিৎ ফিরে পেল।

এরও দু বছর পর গ্রামে পাইনদের বাড়ি যাত্রার আয়োজন হয়েছে—শিবের পালা। গদাই আগেভাগে যেয়ে উপস্থিত। হঠাৎ শোনা গেল যে শিবের অভিনয় করবে সে-ই নেই। তাতে কি? সবাই মিলে তাদের আদরের গদাধরকে দিল তুলে স্টেজে শিব সাজিয়ে। গদাই তো সব জানে—এও তো শুনে শেখা। উল্লাসের কলরোল উঠল। কিন্তু শিবরূপী গদাই তো স্টেজে উঠে বাক্‌শক্তি-হীন, কিছু বলেও না, নড়েও না, শুধু কাঁদে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। শেষটায় তার কানে শিবমন্ত্র দেওয়া হলে তার জ্ঞান ফিরে পেল। এই তার তৃতীয় সমাধি—বয়স তখন মাত্র দশ। এর পর প্রায়ই তার ভাবসমাধি হতে লাগল হরিবাসরে, মনসাভাসানে, শিবের গাজনে। দেব-দেবীর নামগান যেখানে গদাধরও সেখানে বিহ্বল, তন্ময় এক দৈবভাবের রাজ্যে।

পিতৃবিয়োগ ঃ উপনয়ন

গদাধরের তখন সাত বছর বয়স। তার পিতা ক্ষুদিরাম প্রায় আটষট্টি বছর পার করতে চলেছেন। শরীরটা তাঁর অপটু হয়ে পড়ছে বলে ভাগিনেয় রামচাঁদের বাড়ি বেড়াতে গেলেন, রাম-কুমারকে সঙ্গে করে। সেখানে তিনি আরও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়াদশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের পর দেহত্যাগ করলেন। প্রতিমা বিসর্জনান্তে যখন রামচাঁদ মামার খবর নিতে এলেন তাঁকে বললেন, 'আমাকে এবার বসিয়ে দাও।' তাঁকে বিছানায় বসিয়ে দেবার পর তিনি তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণ-পূর্বক দেহত্যাগ করলেন। সিন্ধুর সহিত বিন্দুর মিলন হল।

গদাধরের নয় বছর পার হবার আগেই অগ্রজ রামকুমার গদাধরের উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। বালক কিন্তু বায়না

ধরল যে সে ধনী কামারনী ছাড়া কারও হাতে ভিক্ষা নেবে না। কারণ তার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হয়ে গদাধর তাকে কথা দিয়েছিল যে সে ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করে তাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করবে। সে কথা সে রাখল—এমনই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সে।

কলিকাতা গমন ও পৌরোহিত্য গ্রহণ

সতেরো বছর বয়সে গদাধরকে নিয়ে রামকুমার কলকাতায় চলে এলেন, কারণ গ্রামে বালক বিদ্যাভাস ত্যাগ করে মায়ের সাহায্য ও দেবদেবীর পূজা-আলোচনায় সময় নষ্ট করছিল। সে তো ইতিমধ্যেই চালকলা বাঁধা বিদ্যার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেছে। অর্থের ওপর তার অনীহা। অর্থ অনর্থের মূল। রামকুমার ভেবেছিলেন তাঁর কলকাতার টোলে গদাধর পড়াশুনা করতে পারবে এবং তাঁর যজমানীর কাজেও সাহায্য করতে পারবে। কলকাতায় অনেক টাকাওয়ালা মানুষের বাস, দুটো পয়সাও আসবে। কিন্তু গদাধর তো টাকা চায় না—চায় না দেহের সুখ, লোকমান্য, ঐশ্বর্য। তার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নয়, ঈশ্বর দর্শন। ভাববার কি আছে? যে ঠিক রাজার বেটা তার মাসোহারা ঠেকায় কে?

রাণী রাসমণি জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী—রাজেন্দ্রানী হয়েও যিনি অন্তরে ভিখারিণী, তেজস্বিনী হয়েও যিনি মমতায় গঙ্গামৃত্তিকাসম। জাতে কৈবর্ত, ভাবে অষ্টসখীর এক সখী। রাণী চলেছেন জলপথে বারাণসী, হঠাৎ স্বপ্নাদেশ পেলেন ভবতারিণীর—"কাশী যাবার দরকার নেই, এই ভাগীরথীর তীরেই আমায় প্রতিষ্ঠা কর"। নৌকা তখন দক্ষিনেশ্বর গ্রামের সন্নিকট। নয় লাখ টাকা ব্যয় করে, দশ বছরের চেষ্টায় মন্দির আর মূর্তি তৈরী হল—নবরত্ন কালীমন্দির। উত্তরে রাধা-গোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির, আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মাঝে প্রশস্ত চত্বর। ১২ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল।

নিষ্ঠার জয় হল। প্রতিষ্ঠায় কিন্তু সমস্যা হল। কৈবর্ত রাণীর মন্দিরে অন্নভোগ হবে কি করে, তাঁর তো অধিকার নেই, সে অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের। পণ্ডিতসমাজের বাধা খণ্ডন করলেন পণ্ডিত রামকুমার। তাঁর বিধানে মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করা হল, কাজেই অন্নভোগের আর বাধা রইল না। কিন্তু পূজক কই, ওই ব্রাহ্মণেরা তো বেঁকে বসেছিলেন। রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে রামকুমারই গ্রহণ করলেন পৌরোহিত্য। গদাধরও অগ্রজের সঙ্গে এলেও তার সংস্কার যায় নি, সে কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরাট ধুমধামের মাঝে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি খেয়েই কাটিয়ে দিল। দাদাকে বলে, 'কৈবর্তের অন্ন খেতে পারি নে দাদা।' দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে বাসস্থান হলেও, সে কিন্তু গঙ্গার তীরে গঙ্গাজলে পাক করে খেতে লাগল।

রাণী রাসমণি আর তাঁর জামাই মথুরবাবুর গদাধরের প্রথম দর্শনেই প্রেম! রতনে রতন চেনে। তাঁদের ভারি ইচ্ছা গদাধর মন্দিরে একটা চাকুরি করুক। কিন্তু সতেরো বছরের সে কিশোরটি তো অন্যধারার, আত্মভোলা মানুষ, সে তো নিজহাতে শিব গড়ে, আপন মনেই পুজো করে। ওরে বাবা চাকরি! ঐসব মূল্যবান দেবদেবীর গহনাগাটির ভার নেবে কে? শেষটায় গদাধর সাজনদার মানে বেশকারী হল, যখন তার চার বছরের ছোট বন্ধুসম ভাগ্নে হৃদয় এসে গহনার ভার নিল।

রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পূজারীর হাত থেকে পড়ে যেয়ে গোবিন্দের পা ভেঙ্গে গেল। এমন অঘটন, অশুভ সূচনায় তৎক্ষণাৎ পূজারীর চাকরি গেল। শাস্ত্রজ্ঞরা বিধান দিলেন, ওই ভগ্নমূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন মূর্তি বসাতে। রাণীর তাতে ভারি আপত্তি, তাঁর কাছে বিগ্রহটি তো পাথর বা তামা পেতল নয় যে জলে ফেলে দেবেন। মথুরানাথ হঠাৎ কিশোর গদাধরকে জিজ্ঞাসা করতেই এল নববিধান, জামাইয়ের হাত ভাঙ্গলে যেমন জোড়া হত, সারানো হত, তেমনি বিগ্রহটির পা জুড়ে দেওয়া হোক। সরল সমাধান। রাণী তাই চাইছিলেন। গদাধরই নিখুঁৎ করে সারিয়ে দিল ভাঙ্গা পা, আর তারপরই সেই হয়ে গেল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত। হৃদয় হল কালীমন্দিরের সাজনদার।

রামকুমারের শরীর ভেঙ্গে পড়ছে বলে তিনি গদাধরকে শেখাতে লাগলেন চণ্ডীপাঠ, কালীপূজার বিস্তীর্ণ রীতিনীতি। এরপর নামজাদা তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে গদাধরের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর রামকুমার নিলেন রাধাগোবিন্দের পূজার ভার এবং গদাধরের উপর ন্যস্ত হল কালীপূজার ভার।

গদাধর তো থাকে ভাবের রাজ্যে, সে কি আর নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে যথারীতি পূজা করতে পারে, সে চলে আপন মনে। তার পুজো তো নিয়মের নয়, মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগাযোগ, আদরে, আবদারে, অভিমানে—মা আর ছেলের ছেলেখেলা, নিষ্ঠাই সেখানে সব। গদাধর মায়ের সঙ্গে কথা বলে, মাকে খাওয়ায়, নিজে খেয়ে মাকে খাওয়ায় সেই উচ্ছিষ্ট, মায়ের শয্যায় ছোট্ট হয়ে শোয়, মায়ের পুজোর ফুল নিজেরই মাথায় চড়ায়—এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই অবাক, বিক্ষুব্ধও বটে, কিন্তু কিছু প্রতিকার করার উপায় নেই, কারণ মথুরানাথ তাঁদের এই পাগলাটে ছোট ভট্‌চাযের ব্যাপারে অন্ধ।

সকলে ভাবে গদাধর পাগল, বায়ুরোগ বা মৃগীরোগগ্রস্ত। ডাক্তারও আসে কিন্তু এই যোগজ-ব্যাধি সারাবে কোন্ বদ্যি? দিব্যোন্মাদনা ওষুধে সারে না,—সারে দরশনে, পরশনে। গদাধরের পুজোর সময় শুধুই কান্না—'আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছুই চাই না মা, শুধু তোকে চাই—তুই দয়া করে দেখা দে। তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় দেখা দে।' মায়ের দর্শন মেলে না, অশ্রুর স্রোত বয়ে যায়। শেষটায় যেদিন রোষ চেপে গেল, মায়ের ঘরের খাঁড়াটি নিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলবে বলে উঁচিয়েছে—কি হবে এই জীবন রেখে যদি মায়ের দেখাই না পেলাম—অমনি গদাধরের সামনে আবির্ভূত হলেন শ্যামা মা। 'মা তুই—মা তুই এলি এতদিনে' বলে মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর। মায়ের সঙ্গে সে কথা বলে, গান শোনায়, আদর করে, শাসন করে যেন সত্যিকারের মা। গদাধরের সন্তানভাব।

ভক্তিভাবের পাঁচটি প্রদীপ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। সর্বভাবেই গদাধর মায়ের কাছে সে ভক্তি নিবেদন করেছে। শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান, নিস্তব্ধ সাধনা। দাস্য হচ্ছে

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব—দাস্যভাবে সাধনা করার সময় তো গদাধরের মেরুদণ্ডের প্রান্তদেশ এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল, অনেক সময়ই সে গাছে উঠে বসে থাকত আর আওয়াজ করত 'রঘুবীর' 'রঘুবীর'। সখ্যভাব ছিল অর্জুনের বাসুদেবের প্রতি। বাৎসল্য হচ্ছে যশোদার ভাব গোপালের প্রতি। আর মধুর ভাব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

রামতারক চট্টোপাধ্যায় ওরফে হলধারী বিরাট পণ্ডিত। ভাগবতগীতা, বেদান্ত রামায়ণ ইত্যাদি তার নখদর্পণে। মস্ত বড় বৈষ্ণব আর বাকসিদ্ধ। দারুণ হম্বিতম্বি তার খুড়তুত ভাই গদাধরের উপরে। তার দুর্বাক্যে একবার গদাধরের রক্ত-বমনও হল। শেষটায় দক্ষিনেশ্বর ছেড়ে যাবার আগে সেও বলে গেল ভাইকে, 'তোর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। ঈশ্বর দর্শনের পর আর তর্পণ থাকে না।' সত্যই গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গেলে গদাধরের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল পড়ে যায়।

সারদামণি—পূর্বকথা ও বিবাহ

গদাধরের দিব্যোন্মাদ ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের খবরে কামারপুকুরে মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়ছে। সেখানে মাতৃস্নেহে-যত্নে হয়ত গদাধর ভাল হয়ে উঠবে ভেবে মথুরবাবু গদাধরকে কামারপুকুর পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে যাবার পর অনেকটা সুস্থ ও শান্ত হল গদাধর। বিবাগী ভাবটা কমতে পারে বিয়ে দিলে, এই কথা ভেবে মা চন্দ্রমণি ছেলের কাছে প্রস্তাব তুলতেই গদাধর এক কথায় রাজী, সানন্দে সম্মতি, কারণ সে জানে যে তার সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় দেবীরই আগমন হবে তার ভাবের সংসারে, আসবে তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী, তার দিব্যলীলার পথ প্রশস্ত হবে লীলাসঙ্গিনীর আগমনের পর। তার পাত্রীর সন্ধান চলছে দেখে গদাধর বলে বসল, তোমরা মিছে এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি করছ, সে জয়রামবাটির রাম মুখুজ্যের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।

কামারপুকুর থেকে সাত মাইল দূরে জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিয়ে করেছেন শ্যামাসুন্দরীকে। এঁদের প্রথম সন্তান সারদাকে কোলে নিয়ে একদিন শ্যামাসুন্দরী পিতৃগৃহের সন্নিকট এল্লাপুকুর-পাড়ে এক বেলগাছের তলায় বসে আছেন—হঠাৎ যেন একটি ছোট্ট মেয়ে নূপুর পায়ে নাচতে নাচতে এসে শ্যামার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্যামার মনে হল সেই মেয়ে তাঁর পেটে ঢুকছে। রামচন্দ্রও একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, একটি ছোট মেয়ে তাঁর পিঠের উপর চড়ে গলা জড়িয়ে ধরেছে। 'কে তুমি' জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—'এই এলুম তোমার কাছে'। এই হল সারদার পূর্বকথা।

৮ই পৌষ ১২৬০ সালে সারদার জন্ম, গদাধরের জন্মের আঠারো বছর পর। সে তো সরস্বতী, জ্ঞানদাত্রী তাই তার নাম হল সারদা। তার যখন বছরতিনেক বয়েস, মায়ের কোলে বসে গান শুনছে হৃদয়ের বাড়ি, যেখানে ভীড়ের মাঝে গদাধর বসে আছে। এমন

সময় রঙ্গ করে একজন স্ত্রীলোক বালিকাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কিরে সারু, বিয়ে করবি ? কাকে ?' অবলীলাক্রমে সে তার ছোট্ট হাতটি তুলে দেখিয়ে দিল গদাধরকে। তিনশো টাকা পণ দিয়ে ভ্রাতৃবধূ আনলো রামেশ্বর ১২৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষের দিকে। বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীর মিলন,—হরের সাথে পার্বতীর।

বাসরঘরে রঙ্গিনীরা ধরল সুপুরুষ, সুগায়ক, রসিক গদাধরকে গান শুনবে বলে। গদাধর মুক্তকণ্ঠে গান ধরল শ্যামা-গুণগান। তার তো মনে পড়ে গেছে সেই চিরবাঞ্ছিত, চিরআরাধ্য ভুবনরঙ্গিনীর কথা। সে বলছে তার মাকে, 'ওমা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেঁহুঁশ করে রাখিস নি। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা, আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শুঁটকে সাধু আমি হব না। পতিপত্নী রূপে তারা কামারপুকুরেই রইল একবছর সাত মাস।

এর পর সাত বছর কেটে গেল গদাধরের দক্ষিনেশ্বরে। সারদা জয়রামবাটিতে। আট বছর পর গদাধরকে (তখন রামকৃষ্ণ) মথুর-বাবু দেশে পাঠালেন শরীর সারাতে। শরীরটি রামকৃষ্ণের খারাপ হয়ে পড়েছে মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বার অসুখটি সারিয়ে নিজ শরীরে ধারণ করার জন্য। জগদম্বা তখন মরণাপন্ন। মথুরবাবু স্ত্রী-বিয়োগ-সম্ভাবনায় কাতর,—আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঠাকুরের কথা ভেবে। তিনি রামকৃষ্ণকে বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই, কিন্তু বাবা, তোমার সেবা যে আর করতে পাব না।' করুণাময়ের হৃদয় বিগলিত হল ; রামকৃষ্ণ বললেন, 'যাও বাড়ি যাও, তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে উঠেছেন।' যেন ইন্দ্রজাল! বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর মরণোন্মুখ জায়া উঠে বসেছেন। রোগটি দেহের মধ্যে টেনে নিলেন রামকৃষ্ণ, তার পর ছ' মাস একনাগাড়ে ভুগলেন। তাই মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে কামারপুকুর পাঠালেন সেরে উঠবার জন্য।

কামারপুকুরে পঞ্চদশী সারাদামণি চলে এল স্বামী সন্দর্শনে। সেই কবে প্রথম দেখার পর স্বামীর পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল, বছর সাতেক আগে, প্রথম দর্শনের পর, সে কথা তো তেমন মনে নেই। এই তো বলতে গেলে বুঝে দেখা,—দেখে বোঝার সময় আগত। রামকৃষ্ণকে দেখে তো ঘরের সব রমণীর হাঁ হয়ে

গেছে। রামকৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন হৃদয়ের প্রতি, 'ওরে হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—নইলে আমি ন্যাংটা হব!' রামকৃষ্ণের মুখ ঢাকা হল। সারদাকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি হবে আমার বিদ্যারূপিণী স্ত্রী। তবেই তো ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবার সাথী হবে, অবিদ্যারূপিনী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। গুরু তোতা-পুরী বলে গিয়েছিলেন, স্ত্রীকে কাছে কাছে রাখবি। স্ত্রীকে কাছে রেখেও যার বিবেক বৈরাগ্য ত্যাগ জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে সেই আসল ব্রহ্মজ্ঞ। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরভক্ত।'

সারদার মায়ের খুব দুঃখ। একদিন তো স্পষ্ট বলেই ফেলল, 'কি পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা ঘরসংসারও করলে না, ছেলেপুলেও হল না, মা বলাও শুনলে না—।' শুনতে পেলেন রামকৃষ্ণ, তিনি বললেন 'শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ, সে জন্য দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে যে শেষে মা ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠবে।' 'তা যা বলে গেছেন, তাই ঠিক হয়েছে'—বললেন শ্রীমা একদিন তাঁর স্ত্রী-ভক্তদের।

স্ত্রীকে শেখান—সংসারের কাজ করবে, কেমন করে কখন কি করতে হবে তাও বলে দেন, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বর কাজ দেখেন না, মন দেখেন। কর্ম কার? তাঁর। পানা না ঠেললে যেমন জল দেখা যায় না, কর্ম না করলে তেমন দর্শন হয় না। কর্মেই কৃপা, কর্মেই ভক্তি, কর্ম করতে করতেই কর্ম-ত্যাগ। এক হাতে কর সংসার, আর এক হাতে ঈশ্বরের পদসেবা। সংসারের কাজ শেষ হয়ে গেলে দু' হাতেই পরমপদ আঁকড়ে ধর। এমন ভাবে চলতে চলতে যখন নর্দমার জল আর গঙ্গার জল এক মনে হবে, তখনই ভগবানকে পাবে। রামকৃষ্ণ গাইতেন, 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি? / তাদের দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।'

আবার অদর্শন—বিরহ স্বল্পকাল পরেই। বছরতিনেক পর পিতা রামচন্দ্র চলেছেন কলকাতায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান-যোগে। অষ্টাদশী সারদা বললে, 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নেবে?

দক্ষিনেশ্বর যাব একটু, তাঁকে দেখতে বড় মনকেমন করছে।' সে তো যাবে তীর্থদর্শনে নয়, সে যাবে স্বামীদর্শনে—হিমালয় পেরিয়ে মানস সরোবরে। হাঁটার পথ সবটুকুই। কমল কোমল পা ফেলে ফেলে এগোতে এগোতে মাঝপথে সে জ্বরে পড়ল। রামচন্দ্র তাকে নিয়ে বাধ্য হয়ে এক চটিতে আশ্রয় নিলেন। জ্বরে বেহুঁশ সারদা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখল কৃষ্ণবর্ণা এক অপরূপ ঘর-আলো-করা-কন্যা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে, 'তুমি দক্ষিনেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভাল হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে, তার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।' পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সারদামণি কন্যাটি বললে, 'আমি তোমার বোন হই।' পরদিন ঘুম থেকে উঠে সারদা দেখে সেই আলো-করা-কালো বোনটিও নেই, জ্বরও নেই।

দক্ষিনেশ্বরে এসেই লাজবতী সারদা সোজা চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে, ওষ্ঠপরে সেই সলাজ হাসি, মাথায় ঘোমটা। রামকৃষ্ণ ব্যস্ত পুলকিত হয়ে বললেন, 'তুমি এসেছ!' সেবাময় স্বামী জনান্তিকে বললেন, 'ওরে একখানা মাদুর পেতে দে। কতদূর থেকে আসছে!' তারপর সারদাকে বললেন, 'এখন কি আর আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন করবে! আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি। আমার সেজবাবু হলে তোমায় অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরী করে এলে! আমার সেজবাবুকে দেখতে পেলে না।'

তিন-চারদিন সারদা থাকল তার খবরদারিতে, তাকে নিজ-হাতে ঔষধ-পথ্য খাওয়ান। সেবা যত্নে যখন সারদা সেরে উঠল তখন তাকে নহবতে মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু পাঠিয়েই তাঁর মনে হল, কেন এই দূরে সরিয়ে রাখা স্ত্রীকে? তার প্রতি ভয়, না ঘৃণা, না তাচ্ছিল্য, না অনুকম্পা! প্রতিমায় যদি পুজো হয় ঈশ্বরের, তাঁর দেওয়া দেহ কেন পুজার আধার হবে না? কুমারী পুজা যদি হয়, ভগবতীস্বরূপা স্ত্রীর কেন পুজা হবে না? মনে পড়ে গেল তোতাপুরীর কথা—'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে

এখানে বনবাসে থেকে কাম জয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো বুঝি!'

রামকৃষ্ণ খবর পাঠালেন নহবতে—সারদা, আমার ঘরে এসে শোবে।' সারদা তো এল ভয়ে ভয়ে। স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?' সারদা বললে, 'না, তোমাকে সংসারপথে টানতে যাবো কেন? তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি। কিন্তু আমি তোমার কে?' রামকৃষ্ণ বললেন 'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসো নি—বিদ্যা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে—তুমি জ্ঞানদাত্রী। সারদা শুনছে, ভাবছে আর রামকৃষ্ণের পা টিপছে। পা টেপা হয়ে গেলে রামকৃষ্ণ উঠে সারদাকে প্রণাম করলেন। বললেন, 'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন—সম্প্রতি আছেন নহবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।'

ষোড়শী পূজা

সারদাকে নিজ-পাশে নিদ্রিতা দেখে রামকৃষ্ণের একবার মনে হল এই তো সেই রমণীদেহ—পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু, একে কি ভোগ করা যায় ভেবে সারদার অঙ্গ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে সমস্ত মন কুণ্ঠিত হয়ে সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হয়ে গেল যে সারারাত আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবতরণ করল না। ঈশ্বরের নাম শুনিয়ে তবেই তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনা হল। রামকৃষ্ণের ঘরে তাঁর খাটের সঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতেই সারদার শয্যা। প্রায় এক বছর তারা পাশাপাশি শুলো—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করি রমণ', তাদের শুধু ঈশ্বরালাপ, ঈশ্বরানন্দ। সারদা বলেছে, 'তিনি আমার চর্ম স্পর্শ করেন নি বটে, কিন্তু তিনি আমার মর্ম

স্পর্শ করেছেন।' শেষটায় ১২৮০ সালে ফলহারিণী কালীপূজার অমাবস্যার গভীর রাতে রামকৃষ্ণ তাঁর বিংশতিবর্ষীয়া পত্নীর ষোড়শী পূজার আয়োজন করলেন। ষোড়শোপচারে নিপুণ পূজো। সারদা স্বামীর আদেশে আসনে এসে বসল, পশ্চিমমুখো হয়ে। পায়ে তার আলতা পরিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ, মাথায় দিলেন সিঁদুর। স্পর্শে সারদা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হল। স্পর্শ কেন? 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে'ই স্পর্শ'—বলেন রামকৃষ্ণ। তারপর পত্নীকে নববস্ত্র পরিয়ে থালায় করে মিষ্টি দিলেন খাইয়ে, খাবার পরে পান দিলেন মুখে। তারপর প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'

পূজার চরম লক্ষ্য প্রণাম। জপধ্যান, প্রার্থনা, উপাসনা—সব এই শেষ প্রণামটির জন্য। রামকৃষ্ণ বেলপাতায় নিজের নাম লিখলেন, তার পর আগের আগের যত সাধনার উপচার পোশাক, রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ সব একসঙ্গে জড় করে সারদার পায়ে উৎসর্গ করে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন প্রণাম করে—

'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিনি, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়ণি শিবগেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি—তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি। পূজা শেষ হল। পূজক ও পূজিতা হরপার্বতীসম—দুজনেই তখন বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। সমাধি ভাঙ্গলে রামকৃষ্ণ বললেন, 'পূজা শেষ হয়েছে, এবার যেতে পারো নহবতে।'

ষোড়শী পূজার পরে মা সারদা প্রায় পাঁচমাসকাল ঠাকুরের নিকট ছিলেন। সেই থেকেই ভাব হয় সারদার। আর রামকৃষ্ণের ভাবসমাধির তো বিরাম নেই। তাঁকে সামলাতে নিদ্রার খুবই ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে রামকৃষ্ণই শেষটায় মায়ের আলাদা শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন নহবতে তাঁর মায়ের কাছে। এইরূপে প্রায় এক বছর চার মাস দক্ষিনেশ্বরে কাটিয়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুর ফিরে এলেন ১২৮০ সালের প্রথম দিকে। এই ষোড়শী পূজাই হল রামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনযজ্ঞের সমাপ্তি।

রামকৃষ্ণের ভাবসাধনা দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয় বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে, তুমি তবে বাবা বলো না কেন?'

হেসে সারদা বললে, 'উনি বাবা কি বলছ? উনি বাবা-মা-বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন সমস্ত। যেখানে যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি। উনি আনন্দময়। সেই গান্ধারীর কথা মনে কর—

'ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।'

গদাধরের সাধনা কেন?

অবতার যিনি, নরদেহে যিনি নারায়ণ, তার আবার গুরুবরণ কেন, সাধনভজনই বা কিসের জন্য? একটাই কারণ, নরদেহ যখন ধারণ করেছেন তখন ভগবানকেও মানুষের করণীয় বিধিনিয়মের মাধ্যমেই এগুতে হবে, নইলে সাধারণ মানুষ সেই অন্ধকারেই ডুবে থাকবে। গুরুবরণ ও সাধনভজনের মাঝেই লোকসমাজে ভগবানের বাণী তাঁকে প্রচার করতে হবে, মানবোদ্ধারের জন্য তাঁকে বারে বার দেহধারণ করতে হবে—অধর্ম থেকে ধর্মের রাজ্যে যাবার তাদের পথ দেখাবার জন্য।

'গুরু' কথাটির মানে কি? 'গু' মানে অন্ধকার, 'রু' মানে আলোর দ্যুতি, মানে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবার দিশারী যিনি, যিনি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোয় পৌছে দেন তিনিই গুরু। মানুষ গদাধরকেও তাই গুরুবরণ করতে হল। প্রথম দীক্ষা গুরু তো কেনারাম ভট্টাচার্য, যার কাছে গদাধরের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা।

ভৈরবী

এবার এলেন শিক্ষাগুরু এক মাতৃস্বরূপা নারী। বকুলতলার ঘাটে একটা নৌকা এসে থামল, তার থেকে নামলেন গেরুয়া শাড়ী পরিহিতা ত্রিশূলধারিণী এক পরমাসুন্দরী, বছর চল্লিশ বয়সের ভৈরবী।

গদাধর দেখতে পেয়ে হৃদুকে বললে, তাঁকে ডেকে আনতে। এলেন সন্ন্যাসিনী। গদাধরকে দেখেই বলে উঠলেন, 'বাবা' তুমি এখানে? শুধু এইটুকু জানি তুমি গঙ্গাতীরে আছ।' গদাধর দেখে আত্মহারা। সে যেন তার মাকে খুঁজে পেয়েছে। কত কথাই হল। ভৈরবী বললেন, 'কে তোকে পাগল বলে? একে বলে মহাভাব। এই ভাব হয়েছিল রাধারাণীর, হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—দেহমনকে তোলপাড় করে দেয়।' এই অবস্থায় গদাধর তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল। ভৈরবী নিজের হাতে খাওয়ান তার গোপালকে, যেন সে নন্দরাণী যশোদা আর গদাধর বালগোপাল। ভৈরবী বলেন গদাধরকে দেখিয়ে 'নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব'। একে একে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখালেন গদাধরকে এই মঙ্গল-স্বরূপিণী মাতৃত্বময়ী নারী। শুধু তাই নয়, ঘোষণা করলেন যে গদাধর অবতার। অবতার তো নরদেহে পূর্ণ মানুষ। নরদেহে ভগবান—সত্যি? বললেন মথুরনাথকে, 'তুমি সভা ডাকাও, আমি শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। সাধ্য থাকে কেউ আমায় খণ্ডন করুক।'

চলে এলেন তাই বিচারের জন্য সেযুগের দুই বড় পণ্ডিত। সব দেখেশুনে বৈষ্ণবচরণ রায় দিলেন গদাধর অবতার। ভগবৎ প্রেমে সমাধিস্থ হয়ে গদাধর বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধদেশে বসে পড়ল এবং বৈষ্ণবচরণ নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে আনন্দে তদ্দণ্ডেই সংস্কৃত ভাষায় গদাধরের স্তব করতে লাগলেন—অবতার পুরুষকে স্বীকৃতি ও প্রণাম।

গৌরীকান্ত এলেন। যেমন পণ্ডিত, তেমনি তার্কিক।

তর্কসভায় ঢোকবার সময় তিনি এক প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়েন, তাতেই প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে, এ তথ্যটা গদাধরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তর্যামী। গদাধর প্রবেশ করেই পুরুষোত্তর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলে, দুর্বল হয়ে পড়লেন বিচারক গৌরীকান্ত। তিনি দেখলেন তর্কাতীতকে। তিনিও সিদ্ধান্ত দিলেন গদাধর ভগবানের মহাবতরণ। তিনি বলছেন গদাধরকে, 'আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কি করে জানবে বলুন? যদি কাহাকেও কৃপা করে জানান তবেই সে জানতে পারে।' তন্ত্রে তিনরকম আচার—পশু, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের। বীরাচার হচ্ছে কামনার মধ্যে বাস করেও তাতে আকৃষ্ট না হওয়া, সে বিষয়ে ঔদাসীন্য অর্জন করা। আর দিব্যভাব—ব্রহ্মমগ্ন হওয়া। ভৈরবী গদাধরকে বললেন, 'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি। তুমি কিন্তু দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়েও অনেক উঁচুতে উঠেছ। এবার আমাকে তোমার শিষ্যা কর।' তিনি এবার যেতে চান রূপ থেকে অরূপে, ক্রিয়া ছেড়ে সত্তায়, দীপ্তি ছেড়ে তৃপ্তিতে।

গদাধর বলে, 'যে গুরু সেই আবার শিষ্য। যে মা তিনিই আবার সন্তান। যিনি ভগবান তিনিই আবার ভক্ত।' গদাধরের নিত্য নতুন আস্বাদন। ভক্তের যেমন ভগবান চাই, ভগবানেরও তেমনি ভক্ত চাই। ভক্ত রস, ভগবান রসিক। ভগবান যদি হন পদ্ম, ভক্ত হল অলি। যিনি প্রভু, তিনিই দাস। যিনি মা, তিনিই সন্তান। প্রিয় আর প্রিয়া অভিন্ন। উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হলে তাকে মহাভাব বলে। একটা ভাবে সিদ্ধিলাভ করতেই একটা জীবন কেটে যায়। গদাধরের একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণরূপে।

এই মহাভাবের সন্ধান পেয়েছিল জটাধারী, তিনি বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সাধু। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে ধাতুর বিগ্রহ রামচন্দ্র, কিন্তু তাঁর কাছে জীবন্ত বালগোপাল। বলেন 'রামলালা'। সেই রামলালা হয়ে গেল গদাধরের ভক্ত।

তাই বুঝতে পেরে রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে গদাধরের হেফাজতে জটাধারী ফিরে গেলেন রিক্ত হাতে। বলে গেলেন, 'ও সুখে আছে।' এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা।' এখানে প্রেম আছে—স্বার্থবোধ নেই, বিচ্ছেদ নেই, বেদনা নেই—শুধুই পরিপূর্ণ প্রেম। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। তার চেয়ে বড় মহাভাব, যার আর এক নাম প্রেম। প্রেমই ঈশ্বর।

কৃষ্ণদর্শন

গদাধর এবার রাধারাণীর ধ্যানে বসল, কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া কৃষ্ণদর্শন হবে না। রাধারাণী দেখা দিলেন—নাগকেশরের মত গায়ের রঙ। সেই গৌরবর্ণ মূর্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গদাধরের দেহে। গদাধর রাধারাণী হয়ে গেল। তখন প্রায় ছ'মাস তিনি সালঙ্কারা রমণী বেশে বাস করতেন। এবার হল কৃষ্ণবিরহ কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকথন—অন্য কিছুই শোনে না তাঁর শ্রবণ। শেষটায় একদিন ভাগবত পাঠ শোনার সময় ধরা দিলেন ঘনশ্যাম, সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। ঐ মূর্তির পাদপদ্ম থেকে দড়ার মত একটা জ্যোতি বেরিয়ে প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করল, এবং পরে গদাধরের বক্ষস্থলে সংলগ্ন হয়ে ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করে রাখল—তিনে এক, একে তিন।

প্রেম চার রকম। একাঙ্গী—একপক্ষের একক ভালবাসা, ভালবেসেই তৃপ্তি, অন্যপক্ষ তা গ্রাহ্যও করে না। সাধারণী—যেখানে শুধু নিজের সুখ চায়। তুমি সুখী হও বা না হও বয়ে গেল। সমঞ্জসা—সমান সমান—এস আমরা দুজনেই সুখী হই। সর্বোচ্চ প্রেম হচ্ছে সমর্থা আত্মসুখ বিবর্জিত, শুধু তোমার সুখেই আমি সুখী।

ব্রহ্মদর্শন—তোতাপুরী

কালীমন্দিরে গদাধর ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ তার মনশ্চক্ষে কৌপীন-হীন দীর্ঘ জটাধারী এক স্বর্ণোজ্জ্বল সন্ন্যাসীর মূর্তি ভেসে উঠল। ইনিই তোতাপুরী যাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎ হয়েছে এবং চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করছেন। তোতাপুরী এসে গদাধরের সামনে দাঁড়ালে গদাধর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি তোতাপুরী ?'

'কি আশ্চর্য, তুই আমার নাম জানলি কেমন করে ?' বললেন সন্ন্যাসী।

গদাধর বলল, 'মা বলে দিয়েছেন।' সন্ন্যাসী বললেন, 'ব্রহ্মবিদ্যায় মা-ফা চলবে না।' গদাধরও অবাক। গদাধর মনে মনে হাসল—মানে 'সময় হলে বুঝবে গো বুঝবে'! 'আমি তোকে বেদান্ত সাধনে দীক্ষা দেব যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ। করবি ?'

গদাধর মন্দিরে গেল মাকে জিজ্ঞাসা করতে। ফিরে এসে বলল, 'হ্যাঁ, মা মত দিয়েছেন।' গদাধরের মৃন্ময়ী মাও কথা বলেন তার সাথে। তোতাপুরী শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে মাত্র তিন দিনের জন্য এসেছেন, গদাধরকে দীক্ষা দিয়েই চলে যাবেন। বিধির ইচ্ছা অন্যরকম। ভৈরবী ব্রাহ্মণীরও বড় আপত্তি, বলেন, 'ঐ ন্যাংটার কাছে তুমি যেও না, ও তোমার সমস্ত ভাবটাব নষ্ট করে দিয়ে শুকনো দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।'

পঞ্চবটীর সাধন কুটিরে সব উপকরণ জড়ো হল। হোমাগ্নি জ্বলে উঠল ব্রাহ্মমুহূর্তে, তোতাপুরী গদাধরকে ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষা দিলেন। প্রার্থনা, পরমাত্মন যজ্ঞপতির পদে সমস্ত প্রাণবৃত্তি আহুতি—তুমি আমাতে প্রকাশিত হও, আমাতে দীপ্যমান হও, বুঝতে দাও তুমি আমি এক, দ্বৈত নয়, সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য বিরাজমান। গদাধরকে গুরু নতুন কৌপীন আর কাপড় দিলেন। বললেন, 'এবার তোমার নতুন নাম দেব, তোমার পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। তোমার নাম দিলাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাস যখন দীক্ষা নিলে, 'তুমি শ্রীতে অধিষ্ঠিত হলে। পদবী হল পরমহংস।' পরমহংস কি ? আবিষ্টের মত গদাধর বললে, 'দুধে

জলে একসঙ্গে থাকলেও যিনি হাসের মত জলটি ছেড়ে দুধটুকু নিতে পারেন, বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও যিনি পিঁপড়ের মত চিনিটুকু নিতে পারেন।' এই হল গদাধরের নবজন্ম, নবনাম রামকৃষ্ণ পরমহংস।

গদাধরের দীক্ষা হল গোপনে, কারণ প্রকাশ্যে এসব করতে গেলে শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননী চন্দ্রমণি খুবই আঘাত পেতেন। রামকৃষ্ণ শিখা, সূত্র, যজ্ঞোপবীত যথানিয়মে আহুতি দিলেন। তিনিও পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি করলেন ও করলেন স্বপিণ্ড দান।

দীক্ষা গ্রহণের পর তিনদিনেও রামকৃষ্ণ মনকে নির্বিকল্প করবার চেষ্টায় সফল হল না, কারণ মনের মাঝারে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি ভেসে উঠে। তোতাপুরী বিষম উত্তেজিত হয়ে একটুকরো ভাঙ্গা কাঁচের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করে বলল, 'এই বিন্দুতে মন গুটাইয়া আন।' তারপর মন সমাধিস্থ হল মানে 'সমস্ত নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠে গেল'। তোতাপুরী যাতে শিষ্যের সমাধির বিঘ্ন না ঘটে তাই সাধনঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল। তিনদিনেও সমাধি ভাঙ্গল না রামকৃষ্ণের। গুরু দেখেন শিষ্যের হৃৎস্পন্দন নেই, স্পর্শে চেতনা নেই, যেন ঊর্ধ্ব-অধঃ-মধ্য সমস্ত আত্মবোধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে—একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি। 'য়হ্ ক্যা দৈবী মায়া!' চেঁচিয়ে উঠলেন তোতাপুরী। গুরুর লেগেছিল এই অবস্থায় আসতে চল্লিশ বছর, শিষ্যের তিনদিন!

তিনদিন থাকবার বাসনা মা-না-মানা তোতাপুরীর। থেকে গেলেন এগারো মাস। তিনি জগদম্বা মানেন না। কিন্তু মায়ের অপার করুণা, তিনি তোতাকে দর্শন দিলেন। তোতা বলছেন শিষ্যকে, 'কাল তোর মার দেখা পেয়েছি। দেখলাম যা ব্রহ্ম তাই শক্তি, যা অগ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দু তাই সিন্ধু।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তখন না বলেছিলে মা-ফা মান না? তোমায় কি বলব, আমার মা যে ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।'

তোতা সাষ্টাঙ্গে ভবতারিণী মন্দিরে প্রণাম করে কোথায় যে

চলে গেলেন কেউ জানল না। হঠাৎ যেমন আসা, তেমনি অকস্মাৎ বিদায় মায়ের চরণ বন্দনা করে !

রামকৃষ্ণের এই শেষ গুরু লৌকিক দিক থেকে। এঁরা যা শিখিয়েছেন তার সবই তাঁর জানা ছিল—মনুষ্যদেহ ধারণ করেছেন বলে স্বাভাবিক আচার-আচরণ তাঁকে করতে হয়েছে। গুরুকে কত রূপে দেখা যায় ?

পৃথিবী—শেখায় ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। বৃক্ষ—শেখায় পরার্থে জীবনধারণ। বায়ু—গন্ধ বিতরণ করে অনাসক্তভাবে। আকাশ—মেঘলোক পরিবৃত, মেঘ তাকে ছুঁতে পারে না, অসঙ্গ। জল—শেখায় স্বচ্ছতা, পবিত্রতা। অগ্নি—অকলুষ। কাঠের মাঝে আগুন প্রচ্ছন্ন, নিগূঢ়। চন্দ্র—এর হ্রাস বৃদ্ধি চন্দ্রকলার, চন্দ্রের ন্যায় আত্মা অবিনশ্বর, হ্রাস বৃদ্ধি দেহের। সূর্য—জল টেনে নেয়, ফিরিয়েও দেয় পৃথিবীকে, মানুষকেও বিষয় গ্রহণ করতে হবে প্রত্যর্পণ করার জন্য। কপোত—শেখায় আসক্তি বর্জন। অজগর—শেখায় স্বল্পে সন্তুষ্টি, খাবার যদি নাও জোটে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। সমুদ্র—শেখায় প্রসন্নতা, অভিমান বর্জন। পতঙ্গর মত আগুনের মত ঝাঁপিয়ে পোড়ো না, নারীর রূপ দেখে ঝাঁপ দিয়ো না। মধুকর—শেখায় সঞ্চয়, নিবৃত্তি। হাতি—করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্য গর্তে বাঁধা পড়ে, শেখায় কাম ক্ষতিকর। হরিণ-এর মত ব্যাধের গানে মজে গিয়ে ধরা দেবে না। নৃত্য গীত পরিহার কর। মৎস্য—ধরা দেয় বঁড়শিতে, লোভে। পরিহার কর লোভ, রসনা। পিঙ্গলা—শেখালো আশা ত্যাগই পরম সুখ। মানুষের সঙ্গসুখ কামনা না করে ধাও ঈশ্বর সুখে। বালক তো আপনাতে আপনি মগ্ন। 'লজ্জা ঘৃণা ভয়' এ তিন থাকতে নয়। কুমারী—শেখায় নিষ্কাম সঙ্গরাহিত্য। সর্প—শেখায় অনিকেতনতা। পরের করা গর্তে করে বাস। ঊর্ণনাভ—গড়ে জাল, তাতেই তার বাস ও সংহার। শেখায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়। কীট—ধরে নিয়ে আসে আরও কীট, তারপর সে তার শিকারের ধ্যান করতে করতে কীটত্বই প্রাপ্ত হয়। শেখায় তন্ময়তা ধ্যানের ধারক। নিজ দেহই শ্রেষ্ঠ গুরু, শ্রেষ্ঠ সম্পদ-এর যথাযত্ন সেবা বিনা কোনও তত্ত্বও জানা যাবে না।

'শরীরং আদ্যম্ খলু ধর্ম-সাধনম্।' বাসনা ত্যাগ কর সমাহিত হও।

রামকৃষ্ণ কেন যে ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধনা করেছিলেন তার সুন্দর বর্ণনা তাঁর ভাষায়—'সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করে তার মনে যেমন কখনো কখনো বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাই দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে এবং মার কাছে সর্বদা থেকেও আমার তখন মনে হত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁকে নানা ভাবে ও নানা রূপে দেখব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হলে তার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ধরতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁর ঐ ভাব দেখতে বা উপলব্ধি করতে যা কিছু প্রয়োজন, তা যুগিয়ে এবং আমার দ্বারা করিয়ে সেইভাবে দেখা দিতেন।

ইসলাম সাধনা

তোতাপুরী গেলেন—এলেন আরবি-ফারসি পণ্ডিত গোবিন্দ রায় যিনি ইসলাম প্রেমে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। রামকৃষ্ণের নজর এড়ায় নি, তিনি ছুটে গেলেন। তাঁর বিতর্কহীন বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করতে। রসিক রামকৃষ্ণের নানা রসের আস্বাদন। ভগবানকে যখন এভাবেও ডাকছে কত মানুষ, সে পথই বা কেন এই সকল পথের পথিকের কাছে বন্ধ থাকবে? যত মত তত পথ। ঈশ্বর আর ধর্ম এক নয়। ধর্ম মানে একটা পথ ধারণ করা, যে পথের শেষে যেতে হবে তা যতই দুর্গম হোক, উঠতে হবে পর্বতচূড়ায় যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। পথটি ধরতে হবে শক্ত করে, যতই দুর্গম হোক সে পথ, পেরোতে হবে—পা পিছলে পড়ে গেলে চলবে না। গোবিন্দ রায় রামকৃষ্ণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিলেন। রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলে দুগজি কাপড় লুঙ্গির মত করে পরলেন। 'মা' 'মা' ডাক হারিয়ে গেল। শুধু ডাকছেন 'আল্লা' 'আল্লা'। গো-মাংস খাবার বায়না ধরলেন। নেহাৎ মথুর বাবুর আপত্তি তাই আর হল না খাওয়া, তবে রামকৃষ্ণকে মুসলমান

পাচক এনে মুসলমানী রান্না করে খাওয়াতে হল। সেই সময় তিনি মসজিদে বসে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে নামাজ পড়েন—কালীমন্দিরেও যান না। এই ভাবে তিন দিন অতিবাহিত হবার পর ঐ মতের সাধনফল সম্যক অবগত হলেন। তার পরে আবার কালীবাড়ি 'মা' 'মা' রবে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

খৃষ্ট সাধনা

এর কিছুকাল পর রামকৃষ্ণর একদিন যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানায় বসে গল্প করতে করতে চোখ পড়ল দেওয়ালে টাঙানো মেরী মা আর যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে। মায়ের নধর বাহুবেষ্টনীমাঝে একটি হাস্যময় শিশু, তার পিছনে জ্যোতির বলয়। মায়ের মুখে স্নেহবহনকারী মধুর হাসি। রামকৃষ্ণ পরিচয় পাবার পর ছুটলেন শম্ভু মল্লিকের কাছে ভগবান যীশুর কাহিনী শুনতে। তাঁর মানসচক্ষে তখন সে আর ছবি নয় সাক্ষাৎ দেবতা, প্রেমময় যীশুখৃষ্ট, কৃষ্ণ নয় খৃষ্ট, ঈশান নয় ঈশা। তাঁকেও ত পেতেই হবে।

গীর্জার দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বেদীতে বসে আছেন সেই মা আর এক রূপে, মায়ের অনন্ত রূপ। যিনি খৃষ্ট তিনিই মহেশ্বরী। তিনদিন কাটালেন খৃষ্টান ভাবে। চারদিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছেন রামকৃষ্ণ, হঠাৎ সামনে দেখতে পেলেন গৌরবর্ণ এক বিজাতীয় পুরুষ, বিদেশীর বেশে, তবে তাঁর নাকটা একটু চাপা। যিনি এই যীশু, তিনিই শ্যামল বনমালী, খৃষ্ট আর কৃষ্ণ অভিন্ন। রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গেছেন ঘোড়ার গাড়ী চড়ে, হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি সাহেবের ছেলে ত্রিভঙ্গ হয়ে একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামকৃষ্ণের আবার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হল, হলেন সমাধিস্থ।

রামকৃষ্ণ এই সব অভিজ্ঞতা ও দর্শনের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন, বলছেন, 'মাগো সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী। সকলেই বলে আমার

ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙ্গে কেউ মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, তোমায় কেউ দেখে না।' সবই এক। হিন্দুরা বলে জল, মুসলমানরা বলে পানি, খৃষ্টানেরা বলে aqua বা water —সবই এক পুকুরেরই জল-ভেদ নামে, গুণে নয়।

বৈষ্ণব স্বীকৃতি

রামকৃষ্ণের যাতায়াত সর্বত্র, তাঁকে আমন্ত্রণ না করলেও তিনি যাবেন সেখানে ভগবানের নামগান যেখানে, ভক্ত যেখানে—ভগবান তো সেখানে। কালী দত্তর বাড়ি এক বিরাট হরিসভা বসেছে, ভাগবৎ পাঠ হচ্ছে। ভাবমুখে রামকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত, পদক্ষেপ টলায়মান। তিনি গিয়ে শ্রীচৈতন্যর বসার আসনটির উপর দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, বাহ্যজ্ঞানহারা, দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বগামী, যাতে বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ, বাম হস্ত ধরিত্রীর দিকে। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু নিশ্চল দীপশিখার মত স্থির। দেহে চৈতন্যদেবের সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে, মুখে প্রেমের স্বর্গীয় আভা ও নির্দেশ। ভাষ্যকার, শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই স্তম্ভিত। সমস্ত বৈষ্ণবরা গেলেন ক্ষেপে—এ কি অশোভন আচরণ! তাঁর কানে কৃষ্ণনাম শোনানোয় আবার সম্বিৎ ফিরে এল।

ভগবানদাস বাবাজী শুনে বললেন, 'ভণ্ড, ধূর্ত কোথাকার! আর কোনোদিন ওকে ঢুকতে দিও না হরিসভায়।' এই ভগবান দাসই কিছুদিন পরে লুটিয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ-প্রণামে, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ত রামকৃষ্ণ। ভগবান দাসের আখড়ায় একদিন রামকৃষ্ণ হৃদয়কে নিয়ে উপস্থিত। সর্বাঙ্গ আবৃত পরনের কাপড়। ভগবান দাস হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন. 'উনি কে?' উত্তর এল, 'মামা'। ভগবান দাস চারদিক ঘুরছেন ফিরছেন, আর এক দিব্যগন্ধ পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবছেন, কোনও মহাপুরুষ এসেছেন কি—এমন দিব্যগন্ধ কেন? হৃদয় জিজ্ঞেস করল ভগবানকে, 'আপনি তো সিদ্ধ-পুরুষ, তবে আর মালা রেখেছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিজের জন্য কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হ'বে।' ব্যাস,

নিমেষে বিস্ফোরণ। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের, কণ্ঠে ঝংকৃত হল—'কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি তাড়াবে? তুমি ত্যাগও গ্রহণ করবে? তুমি লোকশিক্ষা দেবার কে? যাঁর জগৎ তিনি না শেখালে তুমি শেখাবে?' রামকৃষ্ণের পরনের কাপড়টিও খসে পড়েছে ভাবাবেগে। রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভগবানদাস এবার বুঝলেন দিব্য সৌরভের উৎস কোথায়, দেখতে পেলেন রামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাব প্রস্ফুটিত। তিনি মধুর কণ্ঠে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'আমার একটি নাম ভগবান বটে, কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন।' ক্ষমাপ্রার্থী ভগবান-দাস রামকৃষ্ণচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। বৈষ্ণবস্বীকৃতি আগেও মিলেছে বৈষ্ণবচরণের কাছে। ভগবানদাস স্বীকার করলেন—যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন, চৈতন্যে আসলে তাঁরই অধিকার।

তীর্থযাত্রা

রামকৃষ্ণ আমাদের মত সাধারণ ভাবভূমি থেকে দেখেই কোনও কিছু স্থির করতেন না, তাঁর আর একটা উচ্চতর ভাবভূমি ছিল মনের, যে অবস্থা থেকে তিনি কোনও তীর্থস্থানের স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পারতেন। ১২৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তীর্থভ্রমণে বেরুলেন। গেলেন কাশী। সেখানে চর্মচক্ষে দেখার বিষয় হৃদয়কে বললেন, 'ওরে এখানেও যা, সেখানেও তা। সেখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগুলোও তেমনি।' উচ্চ ভাবভূমি থেকেই কাশী স্বর্ণময় দেখেছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হলে কি প্রকারে জীব সর্ববন্ধনবিমুক্ত হয় তা বুঝতে পেরেছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করেছিলেন এবং নবদ্বীপে যে আজ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্মাবির্ভাব বর্তমান তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভক্তদের বলতেন, 'যার হেথায় আছে, তার সেথায়ও আছে। যার হেথায়ও নেই, তার সেথায়ও নেই।'

কাশীতে মৌনী ত্রৈলঙ্গস্বামীকেও সাক্ষাৎ করলেন, জীবন্ত বিশ্বনাথ, যিনি সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে বসে আছেন।

গেলেন মথুরায়। ধ্রুবঘাটে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য! দিন পনেরো ছিলেন বৃন্দাবনে, বৈষ্ণববেশে, গায়ে আলখাল্লা, পরণে ডোরকোপনি, কপালে গলায় বুকে হাতে তিলক কাটা। দেহে ও মনে একেবারেই বৈষ্ণবচূড়ামণি। কাঁধে কাঁথার ঝোলা, গলায় ঝোলে তুলসীর মালা—সে কি মনোহর দৃশ্য। নিধুবনে সিদ্ধ প্রেমিকা তপস্বিনী গঙ্গামায়ের দর্শন ও মধুর সঙ্গলাভ করে দক্ষিণেশ্বরের কথা রামকৃষ্ণ সব প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। বলছেন, 'মনে হয়েছিল আর ফিরব না। কিন্তু কিছুদিন বাদে মার কথা মনে পড়ল, মনে হল তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সেবা করবে। এই কথা মনে ওঠায় সেখানে থাকতে পারলুম না।' গঙ্গা-মা রামকৃষ্ণকে দেখেই বুঝতে পারেন যে তাঁর দেহে শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবের প্রকাশ; তিনি রামকৃষ্ণকে ডাকতেনও 'দুলালী' বলে।

এরপর গয়ায় যাবার কথা উঠলে রামকৃষ্ণ সেখানে যেতে অস্বীকার করলেন। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মদর্শনে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পাছে পৃথকভাবে নিজ শরীর ধারণের কথা ভুলে যান এবং সেখানেই তাঁর গদাধরের সঙ্গে পুনর্মিলন হয়ে যায় এই জন্যই না-যাওয়া। ভক্তদেরও কাউকেও যদি তিনি দেববিশেষের অংশ বুঝতে পারতেন, তাহলে ঐ দেবতার বিশেষ লীলাস্থলে যেতে বারণ করতেন।

কুমারীপূজা

তীর্থভ্রমণের পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শুধু সেই কথা। মদ খাবার পর মাতাল যেমন শুধুই আনন্দের কথা বলে, তেমনি শুধু বিভিন্ন তীর্থস্থানে চর্ম ও মানস চক্ষে দর্শনের আনন্দের কথা। এরপর একদিন হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'একটি সুন্দরী কন্যা যোগাড় কর,—আমি পূজা করব।' হৃদয় তো অবাক। যোগাড় হল চোদ্দ বছরের এক সুন্দরী সধবা-কন্যা। সাক্ষাৎ ভগবতী

জ্ঞানে রামকৃষ্ণ তাকে পূজা করলেন, পূজান্তে প্রণামও। শুধু কি তাই, প্রণামীর টাকাও দিতে বললেন। তারপরও শেষ নেই। শুদ্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ বলে এরপর প্রায়ই কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনা হয়, পূজা করেন—হোক না অকুলীন, অপরিচ্ছন্ন।

ভৈরবীর বিদায়

তোতাপুরীর বুদ্ধিতে রামকৃষ্ণ যে সারদাকে নৈকট্য দিচ্ছেন এটা ভৈরবীর ইচ্ছা নয়। আবার ভৈরবীর ভক্তসেবার পদ্ধতিও পল্লীবাসীরা মানতে নারাজ। এমন অবস্থায় একদিন শ্রীনিবাস শাঁখারী রঘুবীরের ভোগ খাবার পর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে প্রবৃত্ত হলে ভৈরবী তাঁকে নিবৃত্ত করেন, কারণ তিনি শ্রীনিবাসের বিশ্বাসভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'আমরাই উহা করিব এখন।' এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার অছিলায় হৃদয়ের সাথে ভৈরবীর তুমুল গোলযোগ। হৃদয় বলে উঠল, 'এইরূপ করলে তোমাকে ঘরে থাকতে স্থান দিব না।' ভৈরবীও ছাড়বার পাত্রী নন, বললেন, 'না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে মনসা শোবে এখন।' সব দেখে রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে হৃদুকে বললেন, 'ওরে তুই কেন এমন করলি? ওরে, ও যে ভক্তিমতী যশোদা।' রামকৃষ্ণই উপায় ঠিক করলেন। ভৈরবীকে ভাব দিয়ে দিলেন—ভয় পাবার ভাব। ভৈরবী তখন থেকে উপরের দিকে তাকান আর ভয় পান। বলেন, 'ওরে আমি কোথায় যাই, কি করি! জগন্নাথ যাই না বৃন্দাবন যাই!' এরপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে রামকৃষ্ণকে পুষ্পচন্দনে সাজিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর প্রায় ছ'বছরের সাহচর্য উপেক্ষা করে চলে গেলেন কামারপুকুর ছেড়ে কাশীর পথে। নিরন্তর বাসের মায়া কাটল।

রামকৃষ্ণের সাধনা

সাধনা তিন রকমের—তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। 'দেখা দে মা, দেখা দে—যদি নাই দিবি তাহলে এ জীবন রেখে

কি হবে, গলায় মারবো কাটারির কোপ,—এই সাধনার পরই রামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন হল প্রথম। এই হল তামসিক সাধনা। রাজসিক সাধন-অনুষ্ঠান, আড়ম্বর, সমারোহ, জাঁকজমক, তীর্থ করা ইত্যাদি। তাও তো হল রামকৃষ্ণর রাণী রাসমণির ব্যবস্থায়, মথুরবাবুর মাধ্যমে। এরপর সাত্ত্বিক সাধনা—ফল চাই না, আড়ম্বর চাই না, শুধু তোমাকেই চাই নীরবে, তোমার নামটি করতে চাই সর্বক্ষণ, নানা ভাবে।

'তোমারি নাম বলব আমি বলব নানা ছলে
বলব একা বসে, আপন মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায় বলব বিনা আশায়
ব'লব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু, শুধুই পুরবে মনস্কাম
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে'

নাম করে করে কাম ধুয়ে ফেলা, আর ঘুচবে যখন কাম পুরবে মনস্কাম।

সুধীসনে রামকৃষ্ণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি মধুসূদন যৌবনে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রভাবে পড়ে সেই কবে ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছেন, খৃষ্টধর্মাবলম্বী কন্যার পানিগ্রহণ করেছেন, বাঙলা ভাষাও ভুলে গেছেন। স্বঘরে স্বদেশে ফিরলেও, মাতৃভাষায় মহাকাব্য রচনা করলেও স্বধর্মে আর ফিরে আসেন নি। আইনজ্ঞ, ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবি মধুর কানে পৌঁছেছে এক সাধুর কথা, তিনি থাকেন দক্ষিণেশ্বরে, সেখানে যে-ই যায় মজে যায়, তাঁর করুণায় বিগলিত হয়ে যায়, আর তাঁর কাছে নাকি আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার-দ্বার অবারিত—ঈশ্বরনন্দের ভাণ্ডার। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন, বললেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।' রামকৃষ্ণ এলেন কুণ্ঠার সাথে, তাঁর কানেও কবি মাইকেলের কথা এসে পৌঁছেছে। ও বাবা, পণ্ডিত মানুষ, আবার সাহেবী ভাব! রামকৃষ্ণ নারায়ণ শাস্ত্রীকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি কথা কও।' নারায়ণ তো কথা কইতে গিয়েমধুসূদনকে আক্রমণ করে বসল, বললে, 'তুমি কেন নিজের ধর্ম ছাড়লে?' মধুসূদন মরমে মরে গেলেন। রামকৃষ্ণের ব্যথা লাগল, তিনি বললেন, 'গান শোনো, শুনলে শান্তি পাবে।' ভক্তি ও শান্তির প্রলেপ দিলেন বুলিয়ে দুঃখী কবির রক্তাক্ত মনে। শান্তিতে চোখ বুজলেন কবিবর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্ত যেখানে ভগবান তো সেখানেই। ভগবান সেখানে যাবেনই' ডাক আসুক আর না আসুক। চললেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের দর্শনে, তাঁর অর্থ, যশ, জাত, ধর্ম সব গৌণ—মুখ্যতঃ তিনি আত্ম-

ভোলা ঈশ্বর-প্রেমিক, প্রেমের পাগল। ঐ রাজর্ষির কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন, বললেন, 'সংসারে থেকেও তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমায় দেখতে এসেছি। তুমি জনকরাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও—একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়ও কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।' অমন রাশভারী মানষ, খুলে ফেললেন গায়ের জামা। সেই প্রলম্ব বাহু পৃথুতুঙ্গবক্ষকে দেখে রামকৃষ্ণ বুঝলেন যে ঈশ্বর দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবে নাক, চোখ, বর্ণ, হাতের ওজন ইত্যাদি লক্ষণ দেখে কারও আধ্যাত্মিক গতি নির্ধারণ করতেন। ভক্তদের এই ভাবে যাচাই করে দেখেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনজগতে থাকলেও পার্থিব এই জগৎটি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতেন, না জানলেজেনেও নিতেন। তিনি তো আর শুঁটকো সাধু নন, রসিকরাজ। একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টারমশাই)-কে ধরে পড়লেন বিদ্যাসাগরকে দেখবেন। চললেন সাগর দর্শনে। ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, 'এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম। আজ সাগরে এসে মিললাম।' পণ্ডিতবর বললেন, 'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'না গো না, নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, বিদ্যার সাগর। তুমি যে-ক্ষীর সমুদ্র। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম—দয়া থেকে। তোমার বিদ্যাদান, অন্নদান সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান লাভ। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে। তুমি তো তাই সিদ্ধ গো। আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ? তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুন খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে।

যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত—এদিকে কামকাঞ্চনে আসক্তি, তারা শকুনের মতই পচা মড়া খুঁজছে। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ?'

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্ম কি'? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সব শাস্ত্র দর্শন এঁটো হয়ে গেছে, তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল এঁটো হয় নি—সে ব্রহ্ম, সে অনুচ্ছিষ্ট।' উল্লসিত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'বা, এই তো বেশ কথা। এ কথা তো কোথায়ও শুনি নি। একটা নতুন কথা শিখলাম আজ।' শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তোমার কি ভাব?' মৃদু হেসে বিদ্যাসাগর বললেন 'সে একদিন আপনাকে গিয়ে বলব চুপি চুপি।' বিদ্যাসাগরের পরোপকারের ভাব। 'পর' মানে ভগবান, 'উপ' মানে সমীপস্থ, 'কার' মানে কর্ম। মানে কর্মের মাঝে ভগবানের কাছে পেঁছে যাওয়া। তাঁর দৃষ্টিতে ভগবান কাঁদছেন মানুষের কষ্টে, ব্যথায়, দুঃখে। বিদ্যাসাগর ঐ চোখের জলটুকু মুছাতে এগিয়ে এসেছেন, দুঃখ ব্যথা যতটা দূর করা যায় সেবায়, সাহচর্যে তার জন্য নিজেকে নিয়োগ করেছেন। তাঁর ভগবান কাঁদছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান হাসছেন। একজন ডুবেছেন কর্মে, আর একজন মেতেছেন ভক্তিতে, প্রেমে, আনন্দে। যাবার সময় বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। গাড়ি করে ফিরে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়? চলেছেন জীবের ঘরে কায়-মনোবাক্যে একটি শাশ্বত বাণী বহন করে, প্রেমের বাণী, ভালবাসার বাণী, শরণাগতের বার্তা বহন করে ভালোবাসার আলো জ্বালাতে, ভক্তিদীপ জ্বালাতে, গাঁথতে একটি প্রেমের বরমাল্য শ্রীচৈতন্যের মত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বছর দেড়েকের ছোট। সাহিত্যে, দেশাত্মবোধে, পাণ্ডিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একদিন বন্ধু অধর সেনকে সাথে করে চলে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে। দুজনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে হেসে বললেন, 'তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো ?' বঙ্কিম বললেন, 'আর মশাই, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।' উত্তর এল, 'তুমি কৃষ্ণ প্রেমে বাঁকা। কৃষ্ণর ব্যাখ্যাতা। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী শক্তি। যুগলমূর্তির মানে কি ? মানে পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আর একটি। যেমন অগ্নি আর দাহিকা। তাঁদের যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, আর শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ শ্রীমতী তাই নীলাম্বর পরেছেন আর অঙ্গ সাজিয়েছেন নীলকান্তমণি দিয়ে. আর শ্রীমতীর পায়ে নূপুর দেখে নূপুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'

বঙ্কিমচন্দ্র অভিভূত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা মশাই, এমন সুন্দর কথা আপনি প্রচার করেন না কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন, 'প্রচারমঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা, খোল ঝুলিয়ে শোভাযাত্রায় ? ওগুলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন। মানুষ ক্ষুদ্র জীব, তার সাধ্য কি সে প্রচার করে। ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন। তুমি নিজে প্রকাশিত হও, দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুর্দিকে. তবে হ্যাঁ, যখন তিনি চাপরাশ দেবেন, তখন।'

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দুএকটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাইবোনের মত থাকতে হয় আর তার সাথে কইতে হয় শুধু ঈশ্বরের কথা।' জননী, জায়া, তনয়া. সহোদরাকে ত্যাগ করে কি হবে ? ভোগিনী ত্যাগ কর, যোগিনীকে নয়, কামিনী ত্যাগ কর দামিনীকে নয়, অবিদ্যাদায়িনীকে ত্যাগ কর, বিদ্যাদায়িনীকে নয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বরের কথা কইতে কইতে দুজনের মনে একই দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। শক্তিযুক্ত না হলে শিব সামর্থ্যহীন।'

বঙ্কিম বলছেন, 'টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার হবে না ? ভক্তি কেমন করে হয় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার সাধ্য কি তুমি পরোপকার

কর? দয়া ঈশ্বরের। মানুষ আবার কি দয়া করবে? দয়ালুর ভিতর যে দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া। বাবা-মার মধ্যে যে স্নেহ দেখ, সব তাঁর স্নেহ। ভক্তি হয় ব্যাকুলতায়। ছেলে যেমন মার জন্য দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই ব্যাকুলতায়। উপরে ভাসলে কি হবে? ডুব দাও কান্নাসাগরে—তবেই পান্না উঠবে। গভীর জলের নিচে রত্ন, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারি, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশেছে। তাই ডোবো। তলিয়েই যাও।'

আর এক সময় দুর্গাচরণকে বলেছেন, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মত। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি গৃহে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমায় দেখে লোকে শিখুক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।' গৃহ ত্যাগ করবে না আশ্রম লাভের জন্য। আশ্রমকেই গৃহে প্রতিষ্ঠা কর।

সৎসঙ্গে রামকৃষ্ণ

কেশবচন্দ্র সেন

কেশব পণ্ডিত মানুষ। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় সকলের সম্ভ্রমের পাত্র। নিজেও তিনি সচেতন যে তিনি সাধারণী নন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ব্রাহ্মসভায় দেখেছেন প্রার্থনা করতে, বক্তৃতা করতে। বুঝেছেন যে ভক্তিমান প্রেমিক পুরুষ কেশবচন্দ্র। একদিন তিনি ওঁদের প্রার্থনা সভায় গিয়ে উপস্থিত। কেশব বেদীতে বসে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে সেজবাবুকে বললেন, 'যতজন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ' ও কি যে সে ছেলে!' কেশবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দেখেছ? তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি।' কেশব বললেন, 'আপনি বসুন'। ঐ পরিবেশে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এসে গেল। তিনি গাইতে লাগলেন 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দরশনে না পায় দরশন, ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।' ঈশ্বরের নানা রূপ, নানা নাম। গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। পণ্ডিত কেশব ভক্তির রসে আপ্লুত হয়ে গেলেন। তিনি নমস্কার করলেন এই স্বল্প-শিক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণকে। যাবার আগে কেশবকে বললেন, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।' মানে সে এখন সংসারতরণী ও বৈকুণ্ঠের তরণী দুটোই বাইতে পারে।

কেশবের কলুটোলার বাড়িতে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে কেশব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন বটে কিন্তু নমস্কার করলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁকে আনত হয়ে প্রণাম করেন দক্ষিণেশ্বরে এলে, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও, যতবার আসেন ততবার। এইভাবে তাদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শেখান, মানে অভিমান-অহংকার ভাঙ্গানো। ব্রাহ্মরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করেন, 'মা' 'মা' ডাক

তাদের আসে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের বলেন, 'যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাকেই আমি মা বলি'—মধুমাখা মায়ের নাম।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিন্তু একদিন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা বেদীতে বসেই ভগবানকে ডাকছেন 'মা' 'মা' বলে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি তাঁকে যে 'মা মা' বলে প্রার্থনা করছিলে এ খুব ভালো, খুব ভালো। কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না।' বিজয়কে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে পারলুম না। সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়, মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখলেই আমার নেশা হয়ে যায়, ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।' সরল সহজ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্রও শেষটায় সহজ হয়ে এলেন, তিনিও ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতে লাগলেন—ডাকেন আর ঝরে নয়নবারি অঝোরে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবেই হবে। শুধু কেশবের মত দয়াময় আর প্রভুতে কি রস হয়?'

কালীবাড়ির নহবতে বাজনা বাজছে। কেশবচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। একজন পোঁ ধরছে আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে রাগরাগিনীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোঽহং সোঽহং করব? আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিনী বাজাব। কেন শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম করব? শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্যে সব ভাবে ডাকব, আনন্দ করব, বিলাস করব। নানা অহংকারে আর মোহে ফোকরগুলি বন্ধ হয়ে আছে। অহংকার আর মোহ ত্যাগ কর… 'শূন্য করিয়া রাখ, বাঁশি বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।'

কেশবচন্দ্র একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, 'একদিন কালীর কথা বলুন। কালী কালো কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দূরে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়, তখন আলো। আকাশ দূর থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—সাদা। সমুদ্রের জলও তাই দূর থেকে নীল। কাছ

থেকে সাদা।' কেশব বুঝলেন এ কামারের কাছে ছুঁচ বেচা।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন কেশব অনেক ফুল সঙ্গে করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে এসে দরজাটি বন্ধ করে প্রাণ ভরে পুষ্পঅর্ঘ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করলেন। আর এক ব্রাহ্মদিক্‌পাল বিজয়কৃষ্ণ তো সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন, বললেন, 'দেখছি যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দু আনা বা বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোলো আনা দেখছি।'

কুচবিহার রাজার সাথে কেশব তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে ব্রহ্মসমাজে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিরুদ্ধপক্ষীয়রা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম নিয়ে আর একটি নতুন সমাজের সৃষ্টি করেন। এই সব শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না। কেশব এতে নিন্দনীয় এমন কি করেছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্র-কন্যাগণের যাতে কল্যাণ হয় তা করবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থেকে ঐরূপ করলে নিন্দার কি আছে? কেশব উহাতে ধর্ম হানিকর কিছুই করে নি। পরন্তু পিতার কর্তব্যপালন করেছে।' কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ভালবাসার আরও এক নিদর্শন, কেশব অসুস্থ হয়ে পড়লে মায়ের কাছে ডাব চিনি মানত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবের শরীররক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তিনদিন শয্যাত্যাগ করতে পারেন নি। মনে হয়েছিল তাঁর একটা অঙ্গ পড়ে গিয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়ের জন্ম। তাঁর বাবার নাম আনন্দকিশোর, অত্যন্ত ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তি। শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে গণ্ডী কেটে কেটে বুকে হেঁটে চলেছেন পুরী

জগন্নাথ দরশনে। এক বছর সময় লাগল পেঁছিতে। জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন, বললেন, 'তুই বাড়ি যা। আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে জন্মাব।' সে কি কথা ? তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দুটি পত্নীই গত হয়েছে, তিনি বিপত্নীক। বিপত্নীকের পুত্র ? সোনার পাথরবাটি। স্বপ্নাদেশ বিফল হবার নয়। দেশে ফেরার পর নদীয়ার গৌরীপ্রসাদের কন্যা স্বর্ণময়ীর সঙ্গে বিয়ে হল। ঝুলন পূর্ণিমার রাতে এক বছর পর স্বর্ণময়ী বিজয়ের জন্ম দিলেন পিটুলী গাছের নিচে, কচুবনের মাঝে। অমন স্থান নির্বাচন কেন ? তাঁর পিতৃসম্পত্তি ক্রোক করতে এসেছিল পেয়াদারা তাই ভয়ে মেয়েরা বাড়ী ছেড়ে সংলগ্ন ভিটেয় সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন—সেই দুঃসময়ে আগমন বিজয়ের।

বিজয়কৃষ্ণ ডাক্তার হয়েছেন মানে উত্তম বৈদ্য—রোগীর বাড়ি বাড়ি ঔষধ পেঁছে দিয়ে আসেন, বসে খাওয়ান। রাস্তাঘাট ভেসে গেছে, খেয়াপারাপার বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বিজয় তাঁর রোগীদের সেবার কথা ভোলেন না। মাথায় পাগড়ী বেঁধে সাঁতরে গিয়েও ঔষধ পেঁছে দিয়ে আসেন, এমনই জীবনদায়িনী ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করছেন—একেই বলে নিষ্ঠা। শিবজ্ঞানে জীব সেবা। তিনি আবার ব্রহ্মসমাজেও যান, হৃদয়ে আলোড়ন চলছে কোথায় ঈশ্বর ! ব্রাহ্মসমাজের নেতা। একদিন পিতৃ-পুরুষ অদ্বৈতাচার্য স্বপ্ন দিলেন, বললেন, 'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে, এবার মহাপ্রভুর শরণ নাও।' গভীর রাতে বিজয় স্নান করতে গিয়ে স্বপ্নে দীক্ষা পেলেন মহাপ্রভুর কাছে। কেশবের সাথে অবনিবনা হওয়ায় তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ কেশবকে অবতার-করণের প্রচেষ্টার তিনি বিপক্ষে ছিলেন অথচ দুজনেই খুব বন্ধু।

বিজয় তখন গুরুর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। কেশব তাঁকে বললেন, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এস ঠাকুরের দর্শনলাভ করে ধন্য হও, মন ভরে যাবে, ভক্তিতে ভেসে যাবে, শান্তিতে ডুবে যাবে তোমার মন। এমনটি দেখ নি, চক্ষু সার্থক কর, দেখ নররূপী নারায়ণকে। বিজয়কৃষ্ণ ছুটে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কি দেখলেন কে জানে ! শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ দুটি বুকের মাঝে

জড়িয়ে ধরলেন—স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমনিকে খুঁজে পাওয়া। দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেললেন। এখন থেকে যখনই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তিনবার বলেন 'শ্রীহরি'। এই ভক্তির সম্বোধনটি তিনবার তিনটি সুরে করেন।

বিজয়কৃষ্ণ আর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এঁড়েদায় এক বৈষ্ণব মন্দিরে চিত্রপট দেখতে গেলেন। নিয়ে গেলেন বিজয়কৃষ্ণই এমনই এক সময়ে যখন মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে, পুজারী বেপাত্তা, কখন ফিরবে ঠিক নেই। দেখার যখন ভাব হয়েছে না দেখে তে যাওয়া যাবে না। দুজনেই বসে রইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধরলেন গান, আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবে মন্দিরপ্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মুহূর্তে কি হল কে জানে! সামনের দরজার খিল আপনি খুলে গেল, পেছনের দরজার তালা তেমনি ঝুলছে! এ তো ধাক্কা দিয়ে খোলা নয়—ব্যাকুলতায় খোলা, আবেগে খোলা। দুদিকেরই আবেগ—ভগবান চান ভক্তকে দেখতে, ভক্ত চায় ভগবানকে। শ্রীমতী মীরাবাঈয়েরও দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রান্ত হবার পর বৃন্দাবনের বন্ধ মন্দিরদুয়ার এমনি আবেগেই খুলে গিয়েছিল!

একদিন বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন চৈতন্যসম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—দক্ষিণেশ্বরে। বলছেন নরেন্দ্রনাথকে, 'জানো, ঠাকুরকে আমি কাল ঢাকায় দেখেছি।' নরেন বললেন, 'সে কি, উনি তো এখানেই আছেন!' ঘটনাটি ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল আগে। ঠাকুর এ বিষয়ে গোপনে শ্রীমাকে বলেছিলেন 'আত্মাটা যে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় এ ভালো নয়। দেহ বুঝি আর বেশিদিন থাকবে না।'

বৈদ্য তিন রকম—উত্তম, মধ্যম, অধম। যে বৈদ্য রোগীর নাড়ি টিপে, জিভ দেখে, 'ওষুধ খেয়ো' বলে ওষুধ দিয়ে চলে যায় সে অধম বৈদ্য। রোগীকে যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তেতো ওষুধ-টুকুও খাইয়ে দেয় সে মধ্যম বৈদ্য। কিন্তু যে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে রোগীকে ওষুধ খাওয়ায় সেই তো উত্তম বৈদ্য। বিজয়কৃষ্ণ তেমনি ছিলেন 'উত্তম বৈদ্য'।

আবার ভক্ত হিসেবেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তম ভক্তদের একজন ছিলেন। ভক্তিও তিনরকম। যে শুধু বিগ্রহে শ্রীহরির পুজা করে,

হরিভক্ত বা অন্য কাউকে নয়, সে অধম ভক্ত। ঈশ্বরে প্রেম, জীবে ভালবাসা, দয়া, বিরোধীর প্রতি বৈরি ভাব পোষণ না করা, এগুলি মধ্যম ভক্তের লক্ষণ। কিন্তু যার সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সবকিছুতেই ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে সেই উত্তম ভক্ত।

এই যে ভক্তি এর পথে যেতে গেলে গুরু চাই। শাস্ত্রপাঠ করতে হবে পথের নির্দেশ পাবার জন্য। কিন্তু চেলা মিলে লাখে লাখ, গুরু মিলে এক। সত্যিকারের গুরুর বড় অভাব। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গুরু না পেলেও চলবে, মিলবে তাঁর দর্শন। শুধু কেঁদে কেঁদে সমস্ত মন দিয়ে ইষ্টের জপ কর, ধ্যান কর—ইষ্টই পথ দেখাবেন—তিনি ঢঙ দেখেন না মন দেখেন।

বিজয়কৃষ্ণও শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কাশীতে হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

ঠাকুরের দ্বাদশ ভক্ত সন্তানের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের স্থান সর্বাগ্রে কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, কারণ ঠাকুরের বাণী তিনি প্রথম বিশ্বের নানান দেশে প্রচার করেন, আর আধ্যাত্মিক শক্তির দিক থেকে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এর পরেই আর এক পরম গৃহীভক্তর নাম মনে জাগে—তিনি নাট্যকার গিরিশ, ঠাকুরের কৃপা যাঁর উপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে, অকৃতি অধম বলে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। নরেন ও গিরিশ ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা সন্তান। তাঁদের কথা একটু বিশদভাবে বলা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)

১৮৮১ সাল, নভেম্বর মাস। আঠারো বছরের নরেন এফ. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। দুর্ধর্ষ তার্কিক, দুঃসাহসী যুবক। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, কথা বলেন প্রত্যয়ের সঙ্গে, তেড়েফুঁড়ে, পাদরীদের, গোরা সৈন্যদের কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, এটর্নী দশহাজার টাকা যৌতুকের বিনিময়ে এক শ্যামবর্ণা পাত্রীর সঙ্গে নরেনের বিয়ে দেবেন বলে প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন, সেটাকে বেঠিক করে দিলেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর আদরের 'বিলে' বা 'বীরেশ্বর'। নরেনের সাধু হবার শখ। কাজেই তিনি বেঁকে বসেন, আর ধর্মপথে যাবার জন্য পা বাড়াবেন ভাবছেন। এমন সময় আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত তাঁকে বললেন, 'ওরে বিলে, শোন দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, দেখতে যাবি?' নরেন বললেন, 'সেটা তো মুখ্খু। কি তাঁর আছে যে শুনতে যাব? মিল, স্পেন্সার, লকি, হ্যামিলটন এত পড়লুম—কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবর্তের কালীর পুজুরী বামুন—ও কি জানে?' রামচন্দ্র নাছোড়বান্দা, তাইতে নরেন বললেন, 'বেশ, যদি রসোগোল্লা খাওয়াতে পারো তো ভালো, নইলে কান

মলে দেব বলছি।' ঐ তখনকার রেওয়াজ—'কান মলা'। ঠাকুর তখন কাশীপুরে রয়েছেন অসুখে ভুগছেন। নিচে বসে আছেন দর্শনপ্রার্থী কৈলাসচন্দ্র বসু, তিনিও বলেছেন 'কান মলে দেবেন'। ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন দূত। দূত এসে ঘোষণা করল—'যে বাবুটি ঠাকুরের কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ঠাকুর ডাকছেন, নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি?' স্খলিত পদে উঠে গেলেন কৈলাস, ফিরে এলেন নিজের কানটি মলে, মানে ঠাকুরকে গুরু বলে মেনে।

শেষটায় একদিন দুই তিন জন বয়স্যসহ নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর দেখে বললেন, 'এসেছিস আয়। একটা গান ধর।' নরেন্দ্রনাথ গাইলেন—

'মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর, কেহ নয় আপন
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।'

ঠাকুরের ঘরে নরেনের এই প্রথম আগমন। এর আগে সুরেশের বাড়িতে একদিন ঠাকুর গেছেন। সেখানে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাড়ায় ভজন গাইতে পারে এমন কেউ আছে?' সুরেশ ধরে আনলেন তাঁদের 'বিলেকে' গান গাইতে। নরেন চলে এলেন, এই প্রথম দর্শন চর্মচক্ষে ঠাকুরের। এ তো সেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি যার কোলে একটি শিশু গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—'আমি চললুম। তুমি এস।' বিবেকানন্দ সেই ঋষি আর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শিশু—মানে নরেন পরিপূর্ণ জ্ঞান, সংযত তেজ, হিমালয়সম আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম, বিগলিত সারল্য, মানসসরোবরসম। ঠাকুর গান শোনার পর নরেনকে

বলেছিলেন, 'একটিবার আমার কাছে এসো দক্ষিণেশ্বরে। কেমন, আসবে?' নরেন সম্মতি দিয়েছিলেন, তাই শেষটায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন, তাঁর নিজ নিকেতনে আগমন।

ঐ গানটির পর নরেন আবার গাইলেন—

'যাবে কি গো দিন বিফল চলিয়ে
আছি নাম দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে—।'

গানটি শেষ হলেই ঠাকুর নরেনের হাতটি ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে, দিলেন দরজাটি বন্ধ করে। আর তারপর কান্না আর কান্না, কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—'এতদিন কোথায় ছিলি? তোর কি দয়া-মায়া নেই? এতদিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্য বসে আছি তোর তা খেয়াল নেই! তোর মনে পড়ল না আমাকে? মাকে সেদিন অনেক করে বললাম, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে? কার সঙ্গে কথা কইব? তারপর দেখলাম মাঝরাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে, বললি, 'আমি এসেছি'। নরেন বললেন, 'কই, আমি তো কিছু জানি না।' ঠাকুর হঠাৎ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে দেববন্দনার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি জানো বৈকি। তুমি যদি না জানো তো কে জানে? কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণপুরুষ, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ করে এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্য দুঃখ দূর করতে। ক্লেশ হরণ করতে—।' নরেন অবাক। জোরজার করে এক থালা মিষ্টি নিয়ে এসে নিজেহাতে খাইয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আবার আসবি। একটু বেশি বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘনঘনই আসবি।'

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি ভগবানকে দেখেছ?' ঠাকুর বললেন, 'তাঁকে দেখেছি বৈকি। তোকে যেমন দেখেছি চোখের উপর, তেমনি, স্পষ্ট, স্থূল, সাবয়ব। শুধু দেখেছি? তাঁর সঙ্গে খেয়েছি, কথা কয়েছি। শুয়েছি একসঙ্গে।' ঝলসে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ, বললেন, 'বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে?' ঠাকুর বললেন 'আমাকে দেখাতে হবে না, তুই নিজেই দেখতে পাবি।

তোর এমন চোখ—তুই দেখবি নে ?' ঠিক এমনই প্রশ্ন করেছিলেন দেবেন ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজ অনুগামী নরেন্দ্রনাথ। প্রশ্ন করেছিলেন, 'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর ?' মহর্ষি তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'তোমার চোখ দুটি কি উজ্জ্বল, যেন যোগী-চক্ষু !'

বিশ্বনাথ দত্ত পয়সাওয়ালা এটর্নি, তবে আয়ের থেকে ব্যয়ের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। সিমলের দত্ত পরিবারের এঁদের একসময় মধ্যবিত্ত কায়স্থদের সমাজে ধনে মানে বিদ্যাগৌরবে অগ্রণী মনে করা হত। পিতামহ দুর্গাচরণ বংশধর বিশ্বনাথের জন্মের স্বল্পকাল পরেই সন্ন্যাস নেন। বুদ্ধিমান, মেধাবী, আরবি-ফার্সি পণ্ডিত এটর্নি বিশ্বনাথ আবার দানশীল ব্যক্তি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিন-চারটি কন্যার জন্মের পর নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

মাতা ভুবনেশ্বরী কাশীতে বীরেশ্বরের কাছে পুত্র কামনায় মানত করেন। কাজেই পুত্রের নাম হল বীরেশ্বর বা বিলে। ভাল নাম নরেন্দ্রনাথ। নরমধ্যে ইন্দ্রসম তাই তো নরেন্দ্র। স্কুলে কোনও নতুন ছাত্র ভর্তি হতে এলে তাকে বিলে জিজ্ঞেস করে, 'তোদের বংশের কেউ সন্নেসী হয়েছে ? আমার ঠাকুর্দা সন্নেসী হয়েছিলেন। এই দেখ আমার হাতে কত বড় চিহ্ন, আমি নির্ঘাত সন্নেসী হব।' বাল্যকালে বড় সহজেই রেগে যেত বিলে, মা তার মাথায় শিবের নাম করে জল ঢেলে দিলে তবেই শান্ত হত। বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে ?' হবু সন্ন্যাসী জবাব দেয়, 'কোচোয়ান হব'—মানে দুটি ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ি চালাব, বাবার তো ঘোড়ার গাড়ি আছে। ঘোড়া দুটি কর্ম ও ধর্মের। আর চাবুকটি চেতনার—চালাবেন বিবেকানন্দ !

নরেনের একটা অদ্ভুত দ্রুত পড়বার শক্তি ছিল। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করলেই বুঝতে পারতেন কি লেখা আছে। ক্রমে ঐ শক্তি এত পরিণত হল যে প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়েই বুঝে ফেলতে পারতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার বছর ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে নামকরা সব বই পড়ে ফেলেছিলেন, এফ. এ. পরীক্ষার পূর্বে ন্যায়শাস্ত্রের যত প্রকারের

ইংরাজী গ্রন্থ ছিল তা আয়ত্ত করে ফেলেন। বি. এ. পড়ার সময় আয়ত্ত করেন ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বর্তমান ও প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস ও ইংরাজী দর্শন। এ ছাড়া অশ্বচালনা, জিমন্যাস্টিক, কুস্তি, মুগুর চালনা, অসি চালনা, সাঁতার, সঙ্গীত সব বিষয়েই খানিকটা নৈপুণ্যলাভ করেন। বলে না—'প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তুলে।' এমনই অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

তাঁর মনে যে গভীর জিজ্ঞাসার উৎপত্তি হবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। ছাত্রাবস্থায় তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে, বিশেষ করে ঈশ্বর সম্বন্ধে। তিনি আছেন না নেই, সাকার না নিরাকার, এক না বহু! এমন মানুষের কাছে কিনা ঠাকুর বলে বসলেন যে তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, কথা বলেছেন, তাঁর সাথে খেয়েছেন, শুয়েছেন! দাও প্রমাণ দাও। কথায় হবে না। আবার ঠাকুর বলেছেন, 'তুই নিজেই দেখতে পাবি।' ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্রনাথ একদিন ঝড়জল মাথায় করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত। উল্লসিত ঠাকুর বললেন, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শুনিস না, তখন আসিস কি করতে?' নরেন বললেন, 'তুমি আমায় শোনাবে কি! তুমি কি কিছু জানো? নিজে কি কিছু পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' উদ্ধত কণ্ঠে, স্পষ্ট অবিশ্বাস! ঠাকুর বললেন, 'বেশ তো—জানি না কিছু, পাই নি কানাকড়ি। তবু যার থেকে কিছুই শেখার নেই, যাকে তুই নিস্ না, মানিস না তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?' হাসলেন নরেন্দ্রনাথ, বললেন, 'আসি কেন? তোমাকে ভালবাসি বলে দেখতে আসি।' ঠাকুর জড়িয়ে ধরেন নরেনকে, বললেন, 'সকলে স্বার্থের জন্য আসে। নরেন আসে আমায় শুধু ভালবাসে বলে।' বলা আর কান্না।

নরেন ভাবছেন, এ কান্নার প্রয়োজন কি? তিনি আমার কাছে আছেন, চোখের সামনে আছেন, প্রতিনিয়তই তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সাথে কথা কওয়া যায়, প্রতিক্ষণ তাঁতেই মিশে রয়েছি। মনে পড়েছে ঠাকুরের সেই বন্দনা—'তুমিই সেই পুরাণপুরুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ'—এই সব ভাবতে ভাবতে খেই

হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছেন ভাবসমুদ্রে, অথচ কোনও স্পষ্ট উত্তর পাচ্ছেন না। এমন অবস্থায় একদিন ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত। তাঁর কুণ্ঠা, ঠাকুরের অজস্রতা। ঠাকুর তাঁর ডান পা'টি নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেনের মনে হল—বাড়ি ঘরদোর সব মহাবেগে উড়ে চলেছে আকাশের পানে; দেহের মাঝে কাঁপন ধরল। তাঁর মনে হল তাঁর আমিত্বের নাশ হবে, মানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চিৎকার করে উঠলেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনায়, 'ওগো তুমি আমার এ কি করলে? আমার যে মা-বাবা আছেন।' ঠাকুর হেসে উঠলেন। সস্নেহে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে থাক। এখন থাক। একবারে কাজ নেই। কালে হবে।' অমনি নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বোধ করতে লাগলেন। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—যেমন নতুন পতি ঘন ঘন আসে তেমনি আসবি বেশি বেশি। ওরে তোকে যখন দেখি তখন আমি সব ভুলে যাই।' ঠাকুর বলতেন, "এর (তাঁর নিজের) ভিতরে যে আছে তাতে স্ত্রীলোকের ভাবের আর নরেনের ভিতরে যে আছে তাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রয়েছে।"

আবার দীর্ঘ অদর্শন, ঘণ্টা, দিন, মাস গণনায় নয়, মনের আবেগে। নরেন্দ্রনাথের দেখা নেই। ঠাকুর তো ঘুমোতে পারছেন না, স্বস্তি পাচ্ছেন না। মাঝরাতে উঠে একদিন রামদয়ালকে বললেন, 'ওগো আমার ঘুম আসছে না। নরেনের জন্য আমার প্রাণের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। যেন জোরে গামছা নিঙড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো?'

রামদয়াল বললে, 'আজ্ঞে ভোর হোক।'

দেরী কি সয়! ভক্তের বিরহে ভগবানের কান্না। বিনিদ্র রজনী যাপন। ভক্তের মাঝেই তো পরিপূর্ণ, তিনি যে এখন নরেন্দ্রবিরহে অপূর্ণ হয়ে আকুলিবিকুলি করছেন। ভক্তের ভজনা, ভক্তের আরাধনা, বিরহে মূর্ছনা এ সবই স্বাভাবিক। একদিন শেষটায় মন্দিরে গিয়ে জগদম্বার কাছে ধন্না দিলেন—'মাগো তাকে এনে দে। তাকে না দেখে থাকতে পারছি নে।'

শেষটায় নরেন্দ্র এলেন, প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর তখন তন্ময় হয়ে ছিলেন, স্পর্শে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন। আর নরেনের বেদান্তবাদীর কাঠিন্য প্রেমময় ঠাকুরের স্পর্শে গলে যেতে লাগল। চোখ দুটি জলে ভরে এল। নরেন বলে বসলেন, 'তুমি ঈশ্বরের রূপটূপ যা দেখ তা তোমার মনের ভুল। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত সব বুঝি। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন, না গান শুনবেন ? ও সব ধাপ্পাবাজি।'

নরেন্দ্রনাথ বলছেন, ঠাকুর ছুটলেন ভবতারিণী মন্দিরে। গিয়ে মাকে বলছেন, 'মা এ কি হল ? এ সব কি মিছে ?' মা বললেন, 'ও সব কথা শুনিস কেন ? কিছুদিন পরে ও নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে।' ঠাকুর তেড়ে এলেন নরেনের কাছে, বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি। চলে যা তুই, এখানে আসিস নে।' যার জন্যে এত কান্না তাকেই দিলেন তাড়িয়ে !

মায়ের রূপ বোঝা কি এতই সহজ। সেই গানটি মনে কর—

'একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে
তোমার ভুবনভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে।
তুমি অন্নপূর্ণা মা শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা তুমি
বৈকুণ্ঠে রমা
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণু রূপ সৃজন লয় পালনে।
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি
স্বয়ং না বোঝালে তা কি বুঝিতে পারি।
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে।'

তুমি তো সর্ব ঘটেই আছো মা। রাম পুজো করেছেন শিবকে, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছেন কালীর, কালী কৃষ্ণের। সাকারও তুমি, নিরাকারও তুমি।

সেদিন নরেন বলছিলেন, 'গিরিশ ঘোষ বলছিল আপনি কিছু লেখাপড়া জানেন না। আমরা সব পণ্ডিত এই সব কথা।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তা তো ঠিকই বলছিল। আমি শুধু সারকথা

জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা, আর গীতার সার ত্যাগী।' আর বই পড়ে কি হবে? 'নিজে পড়ি নি, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো। সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, বড় বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ সব শুনেছি। শুনে তাদের ভিতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (বইগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েছি—'এই নে তোর শাস্ত্র পুরাণ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে' বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি।'

বয়স্যদের পাল্লায় পড়ে একদিন এক বাগানবাড়িতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ এক বারনারীর সম্মুখীন হলেন। তার দৃষ্টি দেখে নরেন বুঝলেন মনের কথাটি। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি? বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে? নিজের কথা একবার ভাবো, ভবিষ্যতের কথা। কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তনু রক্ষাই সাধনা। কিন্তু যখন ভিক্ষা আর মিলবে না?'

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কাইরোয় পথ চলতে চলতে নিষিদ্ধ পল্লীতে এসে পড়েছেন। বারাঙ্গনারা দাঁড়িয়ে। বললেন, 'কি করেছ, নিজেদের দেবীত্ব ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্য সজ্জায়? আত্মস্বরূপকে দেখ, দেখ সেই দৈবী বৈভব। এ করেছো কি! বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন যীশুখৃষ্টের মত। কেঁদে ফেলেছিলেন তাঁর গুরুও—একথা আগেই বলেছি।

একদিন ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশব সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাদের সঙ্গে বসে আছেন। ঠাকুর ভাবমুখে। হঠাৎ চোখে পড়ল নরেনকে। সভাভঙ্গ হলে বললেন, 'দেখলাম কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরকম আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখলাম কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখি তার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দূরীভূত করেছে।' এই হল ঠাকুরের চোখে নরেন্দ্রনাথ।

সেদিন নরেন এলে ঠাকুর বললেন, 'একটু গা না।' নরেন

বললেন, 'ঘরে যাই, অনেক কাজ আছে।' অভিমানী ঠাকুর বললেন, 'তা বাছা আমার কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না।' বাধ্য হয়েই নরেনকে গান ধরতে হল। গাইলেন 'কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।' গাইছেন আর কাঁদছেন। দেখে ঠাকুরের মহাআনন্দ। ভাবছেন তাহলে কি নরেন সাধনার সিদ্ধির জগতে আসছে, নামছে সেই ব্রহ্মের সন্ধানে? নামরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বর-রহিত, অনুচ্চারিত ব্রহ্মের সন্ধানে! সেই সমীরণকে ধরার পথে যা সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ, স্নেহস্বরূপ, স্বাদস্বরূপ, সৌরভস্বরূপ!

নরেন্দ্রনাথের বি. এ. পরীক্ষার পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হল। বিশ্বনাথ দানধ্যান, দরাজ হাতে খরচ করে সংসারের জন্য কিছুই সঞ্চয় রেখে যেতে পারেন নি। কাজেই নরেন্দ্রনাথ খুব বিপদে পড়ে গেলেন। সংসারের কি ভাবে একটু সুরাহা হয় সেজন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু আবার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। ভাবছেন, এ কেমন বিচার? কার বিষয় তুমি বিচার করবে? সেই দৃষ্টি কতদূর যাবে? শেষে আকাশে গিয়ে ঠেকবে না। এই কালো রাত্রির আকাশ দেখে বলবে কি এত তারা কেন? কেন'র জবাব কই? তিনি বিচারের অতীত। তাঁর পায়ে গিয়ে শেষটায় আছড়ে পড়তে হবে। গাইতে হবে—

'আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।'

নরেন্দ্রনাথ শেষটায় ভাবলেন, নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। ঠাকুর ধ্যানে তা জেনে ফেলেছেন। নরেন্দ্রনাথকে বললেন 'জানি আমি তুই মার কাজের জন্য এসেছিস, সংসারে কখনই থাকতে পারবি নে, কিন্তু আমি যতদিন আছি আমার জন্য থাক।'

কেশব সেনের বাড়িতে নববৃন্দাবন থিয়েটার দেখতে এসেছেন ঠাকুর। শিব সেজেছেন বীরেশ্বর, মানে নরেন্দ্রনাথ। অভিনয়ের মাঝখানেই ঠাকুর নরেনকে এই বেশেই নেমে তাঁর কাছে আসতে বললেন। অনিচ্ছায় নরেন নেমে এলে ঠাকুর তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'মান করলি তো করলি, আমারও তোর মানে আছে রাই।' হাত বুলোচ্ছেন আর বলছেন—'হরি ওঁ, হরি ওঁ,

হরি ওঁ।' নরেন্দ্রনাথের অর্ধবাহ্যদশা এসে গেল। একেই বলেই শক্তি সঞ্চার।

পারিবারিক অভাবের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। ঠাকুর থাকতেও তিনি মা-ভাই-বোনদের নিয়ে আধপেটা খেয়ে বা অনশনে থাকবেন? একদিন এসে ঠাকুরকে বললেন, 'আপনার মাকে একবারটি বলুন।' ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, 'তুই গিয়ে বল। একবার কাছে বসে মা বলে ডাক।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার ডাক আসে না।' 'তারই জন্য তো হয় না কিছু সুরাহা'—বললেন ঠাকুর। পরে কানে কানে বললেন, 'আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মার কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মার ভাণ্ডার শেষ করতে পারবি নে।'

নরেন্দ্রনাথ দেখলেন মন্দিরে কেউ নেই—মাকে প্রণাম করে চেয়ে বসলেন, 'মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' তন্ময়ের মত ঠাকুরের কাছে ফিরে এলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, গিয়েছিলি মার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল।' ঠাকুর বলে উঠলেন, 'যা যা ফের যা। গিয়ে বল আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে।' নরেন্দ্রনাথ গেলেন, চাইলেন কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। যা চাইবেন ভেবেছিলেন তা মনে করতে পারলেন না মায়ের কাছে গিয়ে। ঠাকুর আবার পাঠালেন। এবারও নরেন্দ্রনাথ চাইলেন—'আর কিছু চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও'—বলে বারে বার মাকে প্রণাম করতে লাগলেন। ফিরে এলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চাইতে লজ্জা করল।' এই নরেন্দ্রনাথ, এই বিবেকানন্দ। ঠাকুর শেষটায় বললেন, 'আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাকে মার গান শিখিয়ে দিন।' ঠাকুর গাইলেন

'মা ত্বং হি তারা, ত্রিগুণ ধরা পরাৎপরা
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী তুই দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা

আছ সর্বঘটে অঙ্গপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা।'

ঠাকুরের গলার ব্যথা বাড়ছে, খেতেও পারেন না। ভক্তদের মন খারাপ। সন্তানরা মুষড়ে পড়ছে। ঠাকুর তো সেরে উঠতে পারেন, যদি তাঁর মন চায়। সেরেই বা উঠছেন না কেন? ঐ জ্যোতির্ময় তনু ধারণ করেই দেহত্যাগ করতে পারতেন। নরেন রুখে দাঁড়ালেন, ঠাকুরকে বললেন, 'আপনার মাকে বলতেই হবে গলার ব্যথা সারিয়ে দিতে।' হেসে শিশুর মত গলার দিকে ইঙ্গিত করে মাকে বললেন 'মা, এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।' নরেন জিজ্ঞেস করলেন, 'মা কি বললেন?' ঠাকুর বললেন, 'মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "কেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে? তুই তো এদের শত মুখে খাচ্ছিস।" লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলুম না। ঐ ভগবতী তনু কেন ক্ষীণ হয়ে বিলীন হয়ে গেল? ঠাকুর বলছেন নিজের দিকে দেখিয়ে—"এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জ্বল্‌জ্বল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মাকে বললাম, 'মা বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। তাই তো এখন এমন হীন দেহ। নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকে জ্বালাতন করত। সর্বক্ষণ ভিড় লেগে থাকত। যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে। যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা আমাকে অহেতুক ভালবাসে তারাই লেগে থাকবে, তারাই টিকে থাকবে। আগাছার দল শুকিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল ব্যাঙের ছাতা।'

ভক্ত হীরানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভক্তের এত দুঃখ কেন?' নরেন হঠাৎ জ্বলে উঠলেন, বললেন 'দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মনে হয় এক শয়তান। আমি যদি হতুম তাহলে এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো জিনিস তৈরী করতুম।' হীরানন্দ বললেন, 'কেন, দুঃখ আছে বলে? দুঃখ না থাকলে সুখবোধ কোথায়? অন্ধকার না

থাকলে কে আর আলোকের অভ্যর্থনা করত? বিরহ ছিল বলেই তো মিলন এত স্পৃহনীয়। অন্যায় যদি না থাকত, তাহলে কে দিত সুবিচারের মর্যাদা?'

জ্ঞানী জোর করে মায়ার ঘোমটা খুলে দেয়, ভক্ত স্তবস্তুতি করে খোলায় সেই ঘোমটা। ভক্তের আস্বাদনে অহং ভাব থাকে তবে সে অহং ভাবে প্রভু-দাস, মা-ছেলে এই বোধ। ঠাকুর একদিন নরেনকে বলছেন, 'তুই তো শুকনো নোস। তোর চোখ মুখ তো শুকনো নয়। তোর সর্বাঙ্গে যে ভক্তির লক্ষণ, জ্ঞানের পর যে ভক্তি, সেই ভক্তির ব্যঞ্জনা।' নরেন ঈশ্বর সম্ভোগ করবেন আচার লোকশিক্ষাও দেবেন—এই তো বিধির বিধান।

সেদিন ধ্যান করতে বসে নরেন সমাধিস্থ, বাহ্যজ্ঞান আর ফিরে আসে না দেখে গোপাল ছুটে যেয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন নেই। মরে গেছে।' ঠাকুর একটু হাসলেন। অন্তরীক্ষে কি যে চলছে তা তো অন্তরতম অনুভব করছেন! জ্ঞান ফিরে পেলে নরেন ঠাকুরের ঘরে এলেন কেমন যেন টালমাটাল অবস্থা। ঠাকুর তাঁর হাতে একটুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন: লিখেছেন, 'লোকশিক্ষা' প্রবল আপত্তি নরেনের, বললেন, 'পারব না।' ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তোর ঘাড় পারবে।' লোকশিক্ষার চাপরাসটি তো ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দর হাতেই তুলে দিয়ে গেলেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত, দুঃখীর ভার বহন, দুঃখের ভার লাঘব করাই তো তাঁর কাজ।

সেদিন ঠাকুর বলছেন, 'অবতারের শরীর থাকতে থাকতেই তার সেবা-পূজা করতে হয়। আর অবতারের উপর একবার ভালবাসা এলেই হয়ে গেল।' ঠাকুর একদিন সুজির পায়েস খেতে খেতে কাশতে গিয়ে বমি করে ফেললেন, বেরুলো খানিকটা সুজি, পুঁজ, রক্ত। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সামনেই ছিলেন—সমবেত ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবতার তো বলো, খেতে পারো এই উচ্ছিষ্ট পায়েস?' বলতে না বলতেই সেই বমনটুকু একচুমুকে খেয়ে ফেললেন নরেন্দ্রনাথ ওটা প্রসাদ, নিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রথম, নরেন্দ্রনাথ স্বল্পায়ু হবেন কারণ তাঁর নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে

এটা দেখেছিলেন তাঁর দেহচিহ্ন পরীক্ষাকালে প্রথম যুগে। দ্বিতীয়, 'যখন ও বুঝবে ও কে, তখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে' মহাসমাধিতে। সমাধি হচ্ছে মনের সপ্তম ভূমিতে পৌঁছোনো—সে অবস্থায় একুশ দিনে মৃত্যু। ব্যতিক্রম দেখা গেছে ঠাকুরের জীবনে, তাঁর এ অবস্থা হয়েছিল ছ'মাসে। মন যখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে ছাড়া পায়, যায় হৃদয়ে, তারপর কণ্ঠে, তারপর ষষ্টভূমি কপাল। সেখানে পৌঁছানোর পর সপ্তমভূমিতে আরোহণ, তখন নিরন্তর ঈশ্বর দর্শন। সপ্তমভূমি শিরোদেশ। তারপরেই তুমি সাধু হবে, মানে সর্বোপকারক, বিষয়ে অক্ষুব্ধ, সংযত, মৃদু, শুচি আর আকিঞ্চন, অনিচ্ছুক, বিত্তত্যাগী, শান্ত, স্থির, শরণাগত, অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা। এই ভাব জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুর বললেন, 'জ্ঞানীর ভিতর টানা গঙ্গা, আর ভক্তের ভিতর জোয়ার ভাটা।'

তিরোভাবের কিছুকাল আগে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন, কারণ তিনি কয়েকটা দিন আসতে পারেন নি পেটখারাপ বলে। নরেন্দ্রনাথকে তিনি নিজের ঝোলভাতের অগ্রভাগ খেতে দিলেন, তারপর শ্রীমাকে বললেন, 'যা বাকি আছে নিয়ে এস আমার জন্য।' শ্রীমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গেল। শ্রীমা বললেন, 'না না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে রেঁধে দিচ্ছি।' নাছোড়বান্দা ঠাকুর বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি? নিয়ে এস যা আছে।'

রাখাল ঠাকুরকে বলছেন, 'মাকে বলুন যাতে শরীরটা আরও কিছুকাল থাকে।' নরেন্দ্রনাথও প্রতিধ্বনি করলেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে মারও ইচ্ছে হবে।' ঠাকুর জবাব দিলেন, 'না রে না! এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না। এখন মার আর আমার ইচ্ছার মধ্যে কোনও ভেদ খুঁজে পাচ্ছি নে।' পরে নিজ দেহটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে দুটো একটা মা-পূর্ণ, আর একটি ছেলে—অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিলো, আর ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মানুষ হয়ে ভক্তসঙ্গে আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাউলের দল এল, নাচল, চলে গেল—কেউ চিনলে, কেউ চিনলে না। জীবের জন্যই এই শরীর ধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।' এরপর নরেন্দ্রনাথকে

জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর আমাকে কি বলে বোধ হয় ?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ। আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণী।'

তিরোভাবের তিন চার দিন আগে ঠাকুর নরেনকে ডাকলেন। শশী মহারাজকে বললেন, 'নিচে যা। চারিদিকে ভাল করে দেখে আয়, কেউ যেন না থাকে ধারে কাছে। শুধু আমি আর নরেন।' নরেন এসে পাশে বসলেন, ঠাকুরের চোখে তখন নিষ্পলক সর্বসংশয়াচ্ছেদী পরিপূর্ণ অভয় দৃষ্টি। ঠাকুর একদৃষ্টিতে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেনের মনে হল যেন ঠাকুরের দেহ থেকে তড়িৎ কম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজরশ্মি তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। শেষে তিনি নিজেও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এভাবে কত সময় কেটেছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। চেতনা লাভ করার পর দেখলেন ঠাকুর কাঁদছেন।

নরেন বললেন, 'একি, কাঁদছেন কেন ?' ঠাকুর বললেন, 'নরেন আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব তোকে আজ দিয়ে দিলুম। দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, তুই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি। তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলাম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরোবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে—ফিরে যাবি স্বধামে।' এই নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তর। বিবেকানন্দও কাঁদতে লাগলেন। ভক্ত ও ভগবানের যৌথ ক্রন্দন।

প্রায় পাঁচটি বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন ঠাকুর স্বামীজীকে, তারপর তাঁর পরে ভার দিয়ে চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীচৈতন্যদেব পাঁড়মাতাল জগাইমাধাইকে উদ্ধার করেন পাঁকের মাঝখান থেকে, বলেন, 'মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।' মদ খাওয়া ছাড়াও অজস্র বদ অভ্যাসে রপ্ত জগাইমাধাই, অবিশ্বাসী জগাইমাধাই শেষটায় মহাপ্রভুর অঙ্গ থেকে রুধির পাত ঘটিয়েছে, তাই বলে কি মহাপ্রভু ফিরে যাবেন ?

তিনি এসেছেন জনে জনে প্রেম বিলাতে, উদ্ধার করতে, ভগবৎ বিশ্বাস বীজ রোপণ করতে। ঠাকুরও তাই।

নটসম্রাট গিরিশ ঘোষ, লেখার যেমন ধার, অভিনয়ে সম্রাটসম। মদ ওড়ান বোতল বোতল, সঙ্গী নটীরা তখনকার দিনে যাদের বিশেষ চারিত্রিক সুনাম ছিল না। লেখেন যখন ডুবে যান, মদ যখন খান সবই ভুলে যান। বাইশ বোতল বিয়ার খেয়ে বলেন, 'মদ খেয়ে দেখেছি কি জানো? জোর করে মনকে ধরে রাখা, সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে, সেই অবসাদ দূর করার জন্য আবার খাই।' তাঁর সৃষ্টির জন্য, তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য বহু মানুষেরই মন জয় করে নিয়েছেন। তাঁর সুনাম ও দুর্নাম দুইই যেন তুঙ্গে। তাঁর কথা ঠাকুরের কানে পোঁছেছে।

'চৈতন্যলীলা'য় গিরিশ মাধাই-এর অভিনয় করছেন, হল-ভর্তি লোক ভেঙ্গে পড়ছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেই রঙ্গালয়ে যেখানে মাধাই মাত করে রেখেছেন দর্শকবৃন্দকে। ঠাকুরও একদিন সেখানে দেখতে এলেন, তাঁর জন্য বক্সের ব্যবস্থা হল। ঠাকুর আসছেন শুনে গিরিশ নিজেই ছুটে গেলেন তাঁকে গাড়ি থেকে নামাবার জন্য। ঠাকুর আগেই নেমে পড়েছেন। গিরিশকে দেখতে পেয়েই নত হয়ে নমস্কার করলেন। গিরিশ করলেন প্রতিনমস্কার, ঠাকুর আবার নমস্কার করলেন, শেষ নমস্কার মানে জয়, গিরিশের পরাজয়। ঠাকুরের নমস্কার চৈতন্যরূপী গিরিশকে, তিনি তো তাঁকে আগেই দেখেছেন। বলছেন, 'আচ্ছা গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বল তো? এখানকার দেখা নয়, যেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ!' এই সেই দক্ষিণেশ্বরে সাধনার প্রথম যুগে—কালীঘরে বসে আছেন। হঠাৎ যেন একটি ন্যাংটা ছেলে, কোমরে বাঁধা রুপোর পেটি, মাথায় বাঁধা ঝুঁটি, এক হাতে মদের ভাঁড়, আর এক হাতে সুধাপাত্র, এল নাচতে নাচতে। ঠাকুর হাঁক দিলেন, কে তুই, কোথা থেকে আসছিস্।' ছেলেটি বলল, 'আমার নাম ভৈরব, আমি আপনার কাজ করব বলে এসেছি।' এই গিরিশ ঘোষই সেই স্বপ্নে দেখা ভৈরব। ঠাকুর এসেছেন তাঁর নাটক দেখে তাঁকে ধন্য করতে।

নাটকটি দেখতে দেখতে ঠাকুরের বারে বারে সমাধি হয় আর

ভাঙ্গে। অভিনয়ের শেষে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় যিনি পার্ট করেছিলেন এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরের সামনে। পার্ট করবার আগে তিনি গঙ্গাস্নান করে, হবিষ্য খেয়ে আসেন শুচিস্নাত হয়ে। তিনি ডাকসাইটে অভিনেতা নন, অভিনেত্রী বিনোদিনী। এসে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন, 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'

সেদিন গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। এবার আর নমস্কার নয়, একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম—জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য সাথে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। একেই বলে লুটিয়ে পড়া ঠাকুরের পায়ে। একেই বলে প্রেমে পড়া, দেখেই প্রেমে পড়া অথবা প্রেমে পড়ে দেখা। এ প্রেম জন্ম-জন্মান্তরের, এ প্রেম অবিনশ্বর। খুঁজছে, ছুটছে, লুটিয়ে পড়ছে।

পানিহাটি উৎসবের পরে ঠাকুর ফিরছেন, নৌকায় উঠবেন, এমন সময় একজন অচেনা ভক্ত এসে লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন, বললেন, 'ধ্যান হবে অনর্গল প্রবাহ, তৈলধারার মত। ভিতরে আর ফাঁক নেই। তেমনি মনেরও অনর্গল মগ্নতা। আবার ইঁটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে পুজো করো, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর-দর্শন হ'বে।'

ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে গিরীশ বললেন, 'আপনি জানেন না, আমি কত বড় পাপী। আমি যে পাপের পাহাড় করেছি। আমি যেখানে বসি—সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।' গিরিশ বললেন, 'এখন থেকে আমি কি করব ; আমি তো বই লিখি।' ঠাকুর বললেন, 'বই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবে কি করে ? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল। কর্ম যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঝরিয়ে দেবে ঘর্ম, তাতেই তো হ'বে আসল ধর্ম।'

সূর্যোদয় হয়, কুয়াশা কেটে যায়। গিরিশের জীবনে সূর্যোদয় হয়েছে। ঠাকুর একদিন বলছেন গিরীশকে, 'তোমার

মনে বাঁক আছে।' গিরিশ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'এ বাঁক যায় কিসে ?' ঠাকুর বললেন, 'শুধু বিশ্বাসে।' বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূরে। যে ভাবেই হোক, যে রূপেই হোক চাই বিশ্বাস। বিশ্বাসের বড় আর কিছু নেই।

গিরীশ বলছেন যে সব নেশাটেশা ছেড়ে দিয়েছেন। বলেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছায় আর নেশা করতে ইচ্ছা হয় না। ধুলোকাদা মেখেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শুধু এই আমার গৌরব— আর আমার কিছু নেই। এই আমার পাপ, এই আমার ধুলো-কাদা, এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা মুছে নাও তো নাও।' এখন শুধু আমার বলতে আছে শরণাগতি। তাঁর তো ফেলে দেবার জায়গা নেই, সব জায়গাটুকুই তো তাঁর, সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাঁর কোল. তার বাইরে জায়গা কই ?

গিরীশের অদর্শনে ঠাকুর মাঝে মাঝে উতলা হয়ে পড়েন। একদিন যোগীনকে বললেন, 'ওরে গিরিশের বাড়ি থেকে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়, আর দেখে আয় সে কেমন আছে।' গিরিশ ছিলেন রঙে, অন্য আরেক ঢংয়ে। যোগীন এসে ঠাকুরকে বলছেন, 'কি এক ত্রেপণ্ড মাতালের কাছে পাঠিয়েছিলেন, খালি গালাগালি আর খিস্তিখেউড়।'

ঠাকুর বললেন, 'আমাকে শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না ?' যোগীন বললেন, 'আপনার কথা বলতে বলতে প্রণাম করছিল, উত্তরদিকে মুখ করে কি সব বলছিল বিড়বিড় করে আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার বার।' আহ্লাদে ফেটে পড়লেন ঠাকুর। বললেন, 'তবে ? তুই শুধু তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলি নে ? গালাগাল শুনলি, শুনলি নে তার ভক্তির মন্ত্র ? টলে পড়া দেখলি, দেখলি নে তার নুয়ে পড়া ?'

ঠাকুর একদিন গিরিশকে বলছেন, 'সকালে বিকেলে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস। পারবি নে ?'

'সে কি করে সম্ভব, আমার ওঠা কখন যে হবে কে জানে।'

'বেশ খাবার আগে।'

'কোথায় খাই, কখন খাই, খাই কিনা তার ঠিক নেই! তার আবার নিয়ম করে নাম করা!'

'তাও পারবি নে? বেশ তো খেতে বসে একটু নাম করিস মনে করে!'

'রোজ কি খাই? খাওয়ার হুঁশ থাকে কি? কতদিন খাওয়াই হয় না। খিদে পেলে খাবার সময় আর কিছু মনে থাকে না।'

'বেশ তো, শোবার আগে—'

মাথা হেঁট করে গিরিশ বললেন, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে, নামও আসে না।'

তাতেও ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'আমাকে তুই বকলমা দে। তোর হয়ে আমিই করব, তুই বুড়ি ছুঁয়ে দে।'

একদিন গিরিশ বলছেন, 'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত? সময় করে নাম করা যেত তার একটা অন্ত থাকত, এ যে একেবারে অনন্তর মাঝে পড়লুম। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বকলশ লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া।' গিরিশের মন তখন বলছে দেহ-বাক্য-মন সবটুকুই তাঁর চরণে কর সমর্পণ!

মানুষের সেবাই তো ঈশ্বরসেবা। গিরিশকে তাই তো একদিন ঠাকুর বলছেন, 'ঈশ্বর যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে।' গিরিশ বললেন, 'কিন্তু নরেন্দ্র বলেন তিনি অবাঙ্-মানসগোচর। ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'মনের গোচর নয় বটে, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেন নি? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।' বললেন—

'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবাই যে তাঁর অবতার
তাই নিত্য নতুন লীলা কি দেখাবি তার নিত্যলীলা চমৎকার।'

গিরিশ একদিন প্রশ্ন করছেন, 'কোনটা ঠিক—কষ্টে সংসার ছাড়া, না সংসারে কষ্টে তাঁকে ডাকা?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'যারা কষ্টের জন্য সংসার ছাড়ে তারা হীন জাতের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এও করো, ও-ও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাকো। সব ত্যাগ করতে বলি না। তবে হ্যাঁ, তেমন ভক্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল। ভক্তি যদি উন্মাদ

হয়, বেদবিধি মানে না। দূর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছেঁড়ে না, পড়পড় করে ডাল ভাঙ্গে।'

ঠাকুর তখন অসুস্থ। নটী বিনোদিনী ছটফট করছেন একটু তাঁর চরণ দর্শনের জন্য, একটু স্পর্শের জন্য। ভক্তদের কড়া বারণ ঠাকুরের দর্শন, ঠাকুরকে প্রণাম ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কড়াকড়ি আরম্ভ হয়েছে। কি করা যায়? তিনি গিরিশকে না ধরে ধরলেন দানাকালীকে। দিব্যি সাহেব সাজিয়ে বিনোদিনীকে নিয়ে এলেন দানাকালী। দ্বারী কোন বাধা দিল না। বিনোদিনী এসে উপস্থিত ঠাকুরের ঘরে। টুপিটি খুলে রেখে ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ কেশদাম ছড়িয়ে পড়ল, বললেন, 'আমি বিনোদিনী, চৈতন্যলীলার বিনোদিনী', বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। ঠাকুর তো অবাক—আবার খুশিও, ভক্তের আকুলতা তিনি বুঝতে পেরেছেন। আশীর্বাদ করে বললেন, 'খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো!' ভগবৎ দর্শনে, স্পর্শনে, ছলনা। চাতুরিতে দোষ নেই, তা তো আমরা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকার লীলায় দেখেছি।

ঠাকুর অসুস্থ বলে ঠাকুরের ঐ ভৈরব চিত্ত আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় ব্যথিত। গিরিশ একদিন বলেই ফেললেন, ক্ষণিকের জন্যও ঠাকুরকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে তাঁর মন চায় না। বলছেন, 'এদিকে আপনি এখানে বসে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে থিয়েটারে, ভাবছি ছেড়ে দি।' ঠাকুর বললেন, 'কেন? ওতে তো লোক শিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।' কর্মই তো ধর্ম, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন কর। তুমি কি করছ? করাচ্ছেন তিনি! গিরিশ বললেন, 'আমি পাপী। ঘোরতর পাপী।—ধমকে উঠলেন ঠাকুর, 'খবরদার ও কথা মুখে আনবি নে। বল্, আমি মায়ের ছেলে, আমার আবার পাপ কি?' গিরিশের চিন্তা কি? সর্ব পাপ হরার পায়ে তিনি স্থান পেয়েছেন, তাঁর আবার পাপ?

অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুর)

ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার একথা জোরগলায় বলেছিলেন তাঁর গুরু ভৈরবী, এবং সভা ডেকে তা প্রমাণ করা হয় এ কথা আগেই বলেছি। ঠাকুর নিজেও জানতেন যে তিনি ঈশ্বরাবতার, তাঁর সাধনভজন সবই অপরের জন্য। তিনি জানতেন তাঁর মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না ? কারণ তিনি তো সব সময়েই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তিনি বলতেন, 'দুই শত বৎসর পরে এদিকে আসতে হবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করবে ; যারা তখন মুক্তিলাভ না করবে তাদের উহার জন্য অনেককাল অপেক্ষা করতে হবে।'

নিজ দেহরক্ষার কাল বহুপূর্বে তিনি ভাবাবেশে শ্রীমাকে একবার জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "যখন দেখবে যার তার হাতে খাব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করব এবং খাবারের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বে খাইয়ে পরে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করব, তখন জানবে দেহরক্ষার কাল নিকটবর্তী হয়েছে।' এও বলেছিলেন, 'শেষকালে আর কিছুই খাব না, কেবল পায়স খাব।' তিনি বলতেন, 'দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানুষকে অবস্থা ভেদে অবলম্বন করতে হবে।' বলতেন, 'অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।' মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়, তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম। বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ পঞ্চরাত্রের উপদেশমতো উচ্চ নামসংকীর্তনাদি প্রশস্ত। তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছিল যে তাঁর উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, 'যাদের শেষ জন্ম, তারা তাঁর নিকটে ধর্মলাভ করতে আসবে।' পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা

আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সনাতন ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে ঠাকুরের জেহাদ।

এই জেহাদ করতে গেলে ভক্ত চাই যারা তাঁর ভাবের প্রসারের জন্য জীবনপণ করবে। এই কাজের জন্য তিনি প্রধানতঃ যে বারোজন ভক্তের নির্বাচন করেন তাঁরা হলেন নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা, কালী, শশী, শরৎ এবং (হুটকো) গোপাল। এঁদের সব ভাবনেত্র ঠাকুর আগেই দেখেছেন, এঁরা এসেছেন একটি একটি করে, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, 'তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন ক'রে উঠতো, এমন মোচড় দিতো যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হত। লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদতে পারতুম না; কোনও রকমে সামলেসুমলে থাকতুম। আর যখন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আর একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপরে ছাদে উঠে 'তোরা কে সব কোথায় আছিস, আয়রে' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম। মনে হত পাগল হয়ে যাব। তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই। আর আগে দেখেছিলাম বলে তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম। তারপর পূর্ণ যখন এল তখন মা বললে, 'এই পূর্ণতেই তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হল। ঐ থাকের লোকের কেউ আসতে আর বাকি রইল না। মা দেখিয়ে বলে দিলে এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।'

শিষ্যবর্গের হাত পা চোখ মুখ প্রভৃতি শারীরিক সকল অঙ্গের গঠন, তাদের চালচলন আহার নিদ্রা ইত্যাদি বিচার করে তাদের মানসিক গতি, কোন প্রবৃত্তির কতদূর আধিক্য, সাধনার কোন অবস্থায় তারা আছে এ সব ঠাকুর বুঝতে পারতেন এবং তাদের পূর্ণত্ব লাভের জন্য বাকি যাহা করণীয় তা নিজে করতেন। কখনও বা জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখে দিতেন, আধার ভেদে নানা মন্ত্র। কখনও কাউকে স্পর্শ করে তার চেতনার সঞ্চার করাতেন।

স্পর্শেই ভক্তের বাহ্যদশা লুপ্ত হয়ে যেত। দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি ভক্তদের বলছেন, 'মা দেখিয়ে দিচ্ছে কি যে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাউকে ছুঁয়ে দিতেও হবে না। তোদের বলব ছুঁয়ে দিতে, দিবি তাতেই অপরের চৈতন্য হয়ে যাবে। মা যদি এবার (শরীর দেখিয়ে) এটা আরাম ক'রে দেন তো দরজায় লোকের ভিড় ঠেলে রাখতে পারবি না—এত সব লোক আসবে! এত খাটতে হবে যে ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যাথা মারতে হবে।'

এবার কয়েকজন ভক্তের কথা জানাবো।

রাখাল

ঠাকুরের একজন ভক্ত মহিলা এসে একদিন ঠাকুরকে নিরালা পেয়ে তাঁর কোলে একটি তিন চার বছরের ছেলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না, এই তো তোমার ছেলে।' এ ঔরস-জাত পুত্র নয়, মানসপুত্র। এর নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ। এই সেই ব্রজের রাখাল—ভাবসমাধি হয়ে গেল ঠাকুরের। অন্তর্যামীর অন্তরদর্শন।

রাখাল তখন কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে মাকে ছাড়াই চলে আসে একলা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাতৃদর্শনে। একদিন এসে রাখাল দাঁড়িয়েছে সামনে, ঠাকুর হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।' আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরের কোলে গিয়ে বসে পড়ল—যেন সে বালগোপাল, যশোদার কোলে। ঠাকুর তার সর্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন, আর সে ঠাকুরের স্তনপান করতে লাগল—যেন মা যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণ! এতো মাতৃসাধনা। ঠাকুর যখন দেহরক্ষা করেছেন শ্রীমা এসে কান্নায় আছড়ে পড়লেন—'আমার কালী মা কোথায় গেলে গো!'

লাটু

রামদত্ত ঠাকুরের ভক্ত। একদিন তিনি একটি ছোট ছেলে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত। ছেলেটি ঠাকুরের নজর কেড়ে নিল। রতনে রতন চেনে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সঙ্গে ঐ ছেলেটি কে হে? দত্তমশাই বললেন, 'লালটু, আমার বাড়ির চাকর।' ঠাকুর বললেন, 'ও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে। ওকে আমার কাছে রেখে দাও।' ইনিই লাটু মহারাজ, মানে স্বামী অদ্ভুতানন্দ। শিষ্যদের মধ্যে আগমন এঁরই প্রথম। ভগবানের চরণে প্রথম নৈবেদ্য। যারা নিত্যশুদ্ধ তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। জন্মে জন্মে তাদের জ্ঞানচৈতন্য হয়েই আছে। এখানে সেখানে ওসকাতে ওসকাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্ত্রি, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফরফর করে জল বেরুতে লাগল।' বলেই ঠাকুর ছেলেটিকে ছুঁয়ে দিলেন। লাটুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল থরথর করে, আর চোখ দুটি ভেসে গেল জলে। একঘণ্টা পরেও তার ঐ ভাব যায় না, কান্না থামে না দেখে ঠাকুর তাকে আবার যেই ছুঁয়ে দিলেন, অমনি কান্না থেমে গেল। ভাবনা জাগাতেও তিনি, নামাতেও তিনি। একটু স্পর্শ করে সহস্রারের দিকে ভাবটুকু ঠেলে দেন, সইবার শক্তি না থাকলে বা প্রয়োজন বোধে আবার মাথার থেকে নীচের দিকে হাত বুলিয়ে দেন, ভাব নেমে যায়। এ এক যাদুস্পর্শে রূপান্তর। একদিন জিজ্ঞাসা করছেন, 'ওরে লেটো বলতে পারিস, ভগবান ঘুমোন কিনা?' লাটুর তো চক্ষু ছানাবড়া। ঠাকুরই উত্তর দিলেন, 'ওরে জীব-জগতে সকলেই ঘুমের অধীন। কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার জো নেই। তিনি ঘুমুলে সব অন্ধকার। সারারাত সারাদিন জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভয়ে ঘুমুতে পারছে।'

বাবুরাম

শ্যামবাজারে যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়' স্কুলে পড়ছে বাবুরাম। স্কুলের ছাত্র হয়েও তার ভেতরে ভগবৎ-জিজ্ঞাসা জেগেছে। সে যত্রতত্র সাধুসন্ন্যাসী খুঁজে বেড়ায় দেখে একদিন তার দাদা তুলসীরাম বললে ভাইকে, 'যা দক্ষিণেশ্বরে যা, যদি সত্যিকারের সাধু দেখতে চাস!' ছুটলো এক সন্ধ্যায়। রাখালের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে একটি কোণায় চুপটি করে বসে রইল দর্শনের আশায়। এলেন সেই বাঞ্ছাপূরণকারী, টলতে টলতে মাতালের মত। রামলাল বাবুরামকে পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, 'বলরামের আত্মীয়।' বলরাম আর একজন ভক্ত, ঠাকুরের রসদের অন্যতম যোগানদার। ঠাকুর বললেন, 'এস তো, আলোয় এস তো একটি-বার, তোমার মুখখানি দেখি।' খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন, বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' তার হাত দুখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের উপর। ওজন দেখলেন। দেখলেন যেন একটি শুদ্ধ দেবীমূর্তি। বুঝলেন এই শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেটিকে একটু উস্‌কে দিলেই জ্বলে উঠবে, দেবে আলো জগৎজনে। ঠাকুর এঁকে কাছে রাখবেন বলে তার মা মাতঙ্গিনী দেবীকে একদিন বললেন, 'তোমার এই ছেলেটিকে আমায় দেবে?' মাতঙ্গিনীও কৃতার্থ—দেবসেবার অধিকার পাবে তার ছেলে—এতো মায়েরই গৌরব, মায়ের সৌভাগ্য। রয়ে গেল বাবুরাম। এই আমাদের বাবুরাম, সন্ন্যাস নাম স্বামী প্রেমানন্দ। ইনি আবার বাল্যকালে পাঠশালায় স্বামী অভেদানন্দ ওরফে কালীপ্রসাদের সঙ্গে পড়েছেন। ঠাকুরের সন্তানদের বংশ এইভাবে বৃদ্ধি হতে লাগল।

তারক

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের কাছে ছুটে আসতে চায়, এখানে এলেই তো শান্তি, সমাপ্তি। সেও অল্পবয়স থেকেই ধার্মিক। একদিন এসে ঠাকুরকে বলছে, 'মা আসতে দেয় না।' মাতঙ্গিনী দেবী একরকম মা, একরকম আধার। তারকের মা

আর এক রকম, এ জ্ঞান নেই যে জন্ম থেকেই যে ঈশ্বরের জন্ম-বলিপ্রদত্ত, তাকে আটকাবে কে? ঠাকুর বললেন, 'যে মা ও কথা বলে, সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মার অবাধ্য হলেও দোষ হয় না। ঈশ্বরের জন্য গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে, শুধু ঈশ্বরেরই জন্য। তাছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শুনতে হবে বাপ-মার নির্বিচারে।' তারকের সংশয় কেটে গেল, ঠাকুরের সেবার বাধাটুকু ঘুচে গেল, বন্ধন শেষ হল সংসারের। ঠাকুরের সম্প্রদায়ের আর একটি সংযোজন।

মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম)

এঁকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার বলেই জানি। ইনি বিদ্যাসাগর স্কুলের শিক্ষক। ঠাকুরকে প্রথম যেদিন দেখতে এলেন প্রথম দর্শনেই মনে হল জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের সমাপ্তি এখানে, সাধনার পরম ধন নয়নাভিরাম স্বয়ং ঈশ্বর বসে আছেন সামনে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে?' মহেন্দ্র বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।' বেদনাবিদ্ধ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেপুলে হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্র বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও হয়েছে একটি।' ঠাকুর যেন ব্যথা পেলেন, বললেন, 'তোমার মধ্যে যে ভাল লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এসব দেখে বুঝতে পারি।' কিন্তু করুণা থেকে বঞ্চিত হলেন না। কয়েক বৎসর নৈকট্যে ঠাকুরের নানান রূপের ছটা মহেন্দ্রের নজর এড়ায় নি। ঠাকুর তো গৃহী সন্ন্যাসী। দু'একটি সন্তান তাও চাই, এদের মাঝেই তো বংশপরম্পরায় ঈশ্বরের লীলা প্রকাশিত হবে, সৃষ্টি রক্ষা হবে।

সার্কাস দেখছেন ঠাকুর মাস্টারমশাইএর সঙ্গে। দেখার পর তাঁকে বললেন, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর! আর ঘোড়া কেমন ছুটছে বনবন করে! ভাবো দিখিনি কত অভ্যাস করেছে, কত মনোযোগ। কত একাগ্রতা, তবেই না হয়েছে! সংসার করাও কঠিন। অনেক সাধনভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ। সাধনের সময় এই সংসার ধোঁকার টাটি।

কিন্তু জ্ঞানলাভ হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর এই সংসার আবার মজার কুটি। ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তনে লজ্জা করতে নেই। নামগুণকীর্তন অভ্যাস করতে করতেই ভক্তি আসে।'

কালীপ্রসাদ

ভক্ত রসিকের দ্বিতীয় ছেলে কালীপ্রসাদ দশম শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশুনার থেকে তার যোগধ্যান আয়ত্ত করবার বাসনা প্রবলতর। সে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত। ঠাকুরের ভাষায় এ তো নিজের বাড়িতে আসা। তার আবার লজ্জা কি? সে এসে ঠাকুরকে বলল, 'আমি যোগ শিখব।' তার যা রোখ তা ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াল না। বললেন, 'তুমি পূর্বজন্মে প্রকাণ্ড যোগী ছিলে। একটুখানি এখনও বাকি আছে, দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। এই তোমার শেষ জন্ম।' এমন এক কথায় যোগ শিক্ষা দেওয়া সাধারণতঃ ঠাকুর রাজি হন না। দীক্ষাও দেন না চাইলেই। তিনি যখন অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন ক্ষেত্রটি, তখনই সময়মত বীজও তিনি বপন করবেন। পরদিন কালীপ্রসাদের জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। শক্তিটুকু বুকে হাত বুলিয়ে ঠেলে ঊর্ধ্বগামী করে দিতেই সমাধি কালীপ্রসাদের। তাঁকে দিলেন কালীমন্ত্র—'কালীপ্রসাদকে কালীমন্ত্র'। কিছুক্ষণ পরে তার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে ইন্দ্রিয়জগতে আনতে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে নিম্নগামী স্রোতে। ফিরে এল কালীপ্রসাদ ইন্দ্রিয়-জগতে। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার, চৌদ্দ রকম। কর্মেন্দ্রিয়—বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক। অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। ইনিই পরবর্তীকালে হলেন স্বামী অভেদানন্দ। পরম যোগী। যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। সংসার থেকে মনটিকে ঈশ্বরের দিকে ধাবমান করা, বাহ্যগতি থেকে অন্তর্গতিতে গমন—তবেই যোগ। ঈশ্বর-বিন্দুতে মনকে নিয়োগের নামই যোগ।

মনোমোহন

মনোমোহন মিত্রও ঈশ্বর মানতেন না, কিন্তু তবুও তিনি আসেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে, যেখানে যাদু আছে। ঠাকুর তাঁর অবিশ্বাসটুকু শুনে নিলেন স্নেহে-করুণায়-মমতায়-প্রেমে। অবিশ্বাসের পাহাড় থেকে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝরিণী। একদিন ছুটে এসেছেন ঠাকুরের কাছে, কিন্তু কে জানে কেন ঠাকুর তার চরণদুটি গুটিয়ে নিলেন। অভিমানে আঘাত লাগল মনোমোহনের। বললেন, 'বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন! শিগগির বার করুন, নইলে কাটারী এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয়, সকল ভক্তর সাধ মেটাব বলে রাখছি।' তখন ঠাকুর তার ভক্তির কাছে হার মানলেন, পা দুখানি বার করে দিলেন ভক্তের বাহুবন্ধনে। এইভাবে ভক্তর কাছে ভগবানের পরাজয়, এই পরাজয়েই তাঁর চিরজয়।

নিজেকে খুব বড় ভক্ত বলে মনে করার অভিমানটুকু পুষে রেখেছেন বুকে। তাই তো দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বন্ধ করলেন অভিমান করে। ঠাকুর বুঝতে পেরে ডেকে পাঠালে বললেন, 'আমাকে তাঁর কি দরকার? তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন। আমি তাঁর কে?' ডাকব না তোমাকে, কিন্তু ভুলতে পারি কই! অফিসের কাজে মন বসে না, সংসার মাথায় উঠেছে। সর্বক্ষণ অভিমান—'আমি তাঁর কে?' সব সময় কষ্ট। যাঁকে পরিহার করতে চাইছেন তাঁরই উপর দারুণ অভিমান। ভগবান কি এত কান্না সইতে পারেন? মনোবাঞ্ছাপূরণকারী ঠাকুর ছুটলেন মনোমোহনের বাড়ি—'ওরে, তুই যে আমায় দূরে সরিয়ে রেখে সবচেয়ে কাছে টেনে নিয়েছিস!' এই যে আমি এসেছি তোর দ্বারে। ঠাকুরকে দেখে মনোমোহন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে কান্তকবির প্রিয় গানটিতে—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে ধরা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে সখা, চির অবহেলা পেয়েছ।

(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি,

ধরে টেনে কোলে নিয়েছ

'ও পথে যেও না ফিরে এস' বলে কানে কানে কত কয়েছ,

(আমি) তবুও চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে

পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।

(এই) চিরঅপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ ;

(আমার) নিজ হাতে গড়া, বিপদের মাঝে

বুকে করে নিয়ে রয়েছ।"

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ঠাকুর বলেন যে, 'সাধুকে বাজিয়ে দেখবি, রাতে দেখবি, দিনে দেখবি তবেই তাকে মানবি। মেকী কিনা দেখবি না? ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? বাজারে যাবি, সব দোকান ঘুরে দরদস্তুর করে জিনিস কিনবি, ঠকবি নে। ফাউটুকুও নিবি, ছাড়বি নে'। তিনি চান তাঁকে ভক্তরা বাজিয়েই দেখুক। এমন একজন দেবেন মজুমদার। নরেন্দ্রনাথের মত তিনিও বিছানার নিচে একটা দুআনা রেখে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তাতেও সাধ মেটেনি।

একদিন ঠাকুর তাকে বললেন, 'ওগো বড় মন কেমন করছে। অনেকদিন তাকে দেখি নি।' কে সেই মানুষটি? সর্বনাশ! একজন স্ত্রীলোকের নাম করলেন ঠাকুর। দেবেন তো অবাক! সন্ন্যাসীর মন স্ত্রীলোকের জন্য ব্যাকুল হয়েছে এ কেমন খাপছাড়া কথা। সঙ্গে চললেন সেই বাড়ি। পথে মন্দির পড়ে, মসজিদ পড়ে, মদের দোকান পড়ে, বারান্দায় দাঁড়ানো বারবণিতাদের চোখে পড়ে—সে সব জায়গায়ই ঠাকুরের প্রণাম, সবেতেই তো হরিনাম, সবই হরির বল, মায়ের বল, নানা রূপ। সেই মেয়েদের বলছেন, 'মা আনন্দময়ী'। ঠাকুর বলেন, 'আমি কারও ভাব নষ্ট করি না। যার যা ভাব তাই রক্ষা করি। এ কথা বোলো না আমার ভাবই সত্য, অপরেরটা মিথ্যা।'

এই বোধের বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে

শাক্তমতে দীক্ষাও দিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত ছিলেন। ঠাকুর চলে গেলেন সে বাড়ির অন্দরমহলে, পেছনে দেবেনও আছেন, পরীক্ষা করবেন সাধুর গন্তব্যস্থল। দেবেন দেখলেন বালকের মত আলুথালু হয়ে বসে আছেন ঠাকুর, আর তাঁকে স্বহস্তে খাওয়াচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা আর তাঁর দুচোখ দিয়ে বইছে অশ্রু আনন্দে, ভাবের আবেগে, মুখে যশোদা মায়ের স্নেহ ঝরছে। সেই বৃদ্ধা মহিলা বলছেন, 'চৈতন্য চরিতামৃতে পড়েছিলুম, তাঁর মা তাঁকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। কি আশ্চর্য, আমার সে আশা আজ পূর্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে।' এই তো লীলা, সকলে কি দেখতে পায়?

ভক্তের সাতখুন মাপ। একদিন ঠাকুরের কাছে সুরেন মিত্তিরের নামে নালিশ করল সালিশীর জন্য। বললে, 'সুরেন মিত্তির মদ খায়। ওকে বারণ করুন।' ঠাকুর ধমকে উঠলেন, 'তাতে তোর কি মাথাব্যথা? ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে।' সুরেনকে ঠাকুর বলেন, 'ওরে সুরেন্দর, মদ খাবি তো খা না, কিন্তু দেখিস যেন পা না টলে। মার পাদপদ্ম থেকে যেন মন না টলে। শোন্, মদ খাবার আগে ঐ বিষটুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে।' বল 'মা, তুমি এর বিষটুকু খাও, সুধাটুকু আমাকে দাও।' সেই প্রিয় গানটি ঠাকুরের—

'ওরে সুরা পান করি না আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে
আমার মন মাতালে মাতাল করে
মদ মাতালে মাতাল বলে।'

মহেন্দ্রলাল সরকার

ডাক্তার বদ্যি তো কতই এসেছে এই সাগরসঙ্গমে, ঠাকুরের দর্শনে সেবায়। কিন্তু তারা সবাই বুঝে গেছে যোগজ ব্যাধি ওষুধে সারে না। তাদের পুঁথিগত বিদ্যার চিকিৎসার জ্ঞানের অভিমানটুকুই ত্যাগ করতে হয়েছে এখানে এসে। মহিমাচরণ বলছেন, 'আপনার যখন অসুখ তখন ডাক্তাররা আর কি করবে? এ হচ্ছে ডাক্তারদের অহঙ্কার ভাঙ্গানো।' ঠাকুর মহেন্দ্রলাল

সরকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি খুব ভালো ডাক্তার। আর এত বিদ্যা।' মহিমাচরণ বললেন, 'তা কে সন্দেহ করে? উনি জাহাজ আর আমরা ডিঙি। কিন্তু ওখানে (ঠাকুরের পায়ের দিকে দেখিয়ে) সবাই সমান।'

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সে যুগের নামকরা ডাক্তার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম. ডি.। অধুনা এ্যালোপ্যাথী ছেড়ে হোমিওপ্যাথী নিয়ে মেতেছেন সত্য সন্ধান করবার জন্য। ইনি সেই উত্তম বৈদ্য যিনি রুগীর রোগ সারাবার জন্য ব্যস্ত, পয়সার জন্য নয়। গিরিশ ঘোষ বলছে ডাক্তারকে, 'আপনি যে তিন চার ঘণ্টা ধরে এখানে বসে থাকেন (ঠাকুরের চিকিৎসায়) আপনার আর কোনও রোগী নেই?' ডাক্তার জবাব দিলেন, 'আর ডাক্তারী আর রুগী! যে পরমহংস হয়েছে, তাতে আমার সব গেল। প্রতিদিনই এই সত্যটাকেই উপলব্ধি করছি, আরেকটা কোনও শক্তি সমস্ত প্রাণীজীবনকে চালনা করছে। যতই ওষুধ-বিষুধ দিই, ছুরি কাঁচি চালাই আমরা কিছু নয়। শুধু ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে। যার মৃত্যু নিশ্চিত, কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে?' ঠাকুর বলেন, 'এ নদীর নাম কর্মনাশা। এ নদীতে ডুব দিলে মহাবিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায়। সে ব্যক্তি আর কোনও কাজ করতে পারে না।' তার দড়িদড়া হালপাল সবই যাবে রসাতল। ডাক্তারের বিদ্যের অহঙ্কার নস্যাৎ করে দিয়ে গেলেন ঠাকুর। ডাক্তার ঠাকুরের কাছে বসে থাকেন আর দেখেন ভগবানকে, শোনেন দিব্যবাণী। যখন ঠাকুরকে কথা বলা বারণ করে দিলেন গলার ব্যথার জন্য তখন তাঁর বাণী তাঁর কর্ণে যেন ঝংকৃত হয় বলে বললেন, 'তুমি শুধু আমার সঙ্গে কথা কইবে।' ছিলেন জড়বাদী, দেখতে শিখলেন যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ জড় ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানী ছিলেন, বুঝলেন বিজ্ঞান জ্ঞানের কতটুকু, সমুদ্রে গোষ্পদ তুল্য জলের সমান। অবতারতত্ত্ব মানতেন না, দেখলেন জীবন্ত ভগবানকে, নরদেহে নারায়ণকে, অবতার-বরিষ্ঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। বিজ্ঞান উপেক্ষা করে জ্ঞানের দিকে ধাবমান হলেন।

ডাক্তার তাঁর ডাক্তারী করতে এসে পেলেন ভক্তি রসের সন্ধান।

তাই তো ডাক্তার হয়েও তিনি ঠাকুরকে বলেন, 'তুমি শুধু আমার সঙ্গে কথা কইবে।'

ঠাকুর একদিন ডাক্তারকে বলছেন, 'ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্তে অনেক তফাত। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত। সন্দেশেও বসছে আর পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বর-ভাবেতেও রয়েছে আবার-কামিনী কাঞ্চন নিয়ে মেতেছে। ঠিক ঠিক ভক্ত চাতক পাখীর মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র, তেরো নদী ভরপুর, সে জল সে ছোঁবে না। ছোঁবে না কামিনী-কাঞ্চন। পাছে আসক্তি হয় কাছেও রাখবে না। অবশ্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। তবে এ জানবে টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়ও হয়, থাকবার একটি স্থান হয় আর ঠাকুরের আর সাধু ভক্তদের সেবা হয়। ব্যস এই পর্যন্ত। আর স্ত্রী! স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। তবে একটি দুটি ছেলে হয়ে গেলে ভাইভগিনীদের মত থাকবে।'

একদিন ডাক্তার বলছেন ঠাকুরকে একজন ভক্তর সম্বন্ধে, 'ও তো আপনার চেলা।' ঠাকুর রুখে উঠলেন, 'আমার কোনও চেলা নেই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলের মামা।' তাই তো ঠাকুর তাঁর চেলাদেরও বারংবার প্রণাম করেছেন। সর্বত্রই সর্বভূতে তো ঈশ্বরই বিরাজমান।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

ঠাকুর সহসা কোনও কোনও ভক্তদের জিজ্ঞেস করে বসতেন, 'আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয় বল দেখি?' এই প্রশ্নে কেউ বলত 'আপনি যথার্থ সাধু', 'যথার্থ ঈশ্বরভক্ত', 'মহাপুরুষ', 'সিদ্ধপুরুষ', 'ঈশ্বরাবতার', 'স্বয়ং শ্রীচৈতন্য', 'সাক্ষাৎ শিব', 'ভগবান'। ব্রাহ্মসমাজবর্তী বা সেখান থেকে প্রত্যাগতরা বলত, 'আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ভক্তশ্রেণীদের

সমতুল্য ঈশ্বর-প্রেমিক।' খৃষ্টধর্মাবলম্বী উইলিয়ামস বলেছিলেন 'নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি'।

এই সব শুনে ঠাকুর বুঝতে পারতেন যোগ বিভূতির দ্বারা কার কোন বিশ্বাস, কি ভাব, কতটা সে গ্রহণ করতে পারবে। তাদের প্রতি সেই রকম আচরণ করতেন। ঠাকুর কখনও কারও ভাব নষ্ট করতেন না, তাদের নিজস্ব ভাবের পরিপুষ্টির জন্য যা করণীয় সেইরকম উপদেশ দিতেন। মানে যে পেটে যেমন সয় তা তো মা জানেন, সেই জন্য মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল, ছোট বড় মাছ কি হবে কে খাবে তা মা ঠিক করেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার —নরেনের নিচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা যেতে পারে। এখানে এসে ধর্মলাভ করবে বলে যাদের বহুপূর্বে দেখেছিলাম, পূর্ণের আসায় সেই থাকের ভক্ত সকলের আগমন পূর্ণ হল—এরপর এরকম কেউ আর আসবে না।' শ্যামবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রবাবু, যাকে লোকে বলত 'ছেলেধরা মাস্টার', তিনিই প্রথম তের বছরের ছাত্র পূর্ণকে ঠাকুরের কাছে গোপনে পাঠান স্কুল পালিয়ে। ছেলেধরা মাস্টার কেন? তিনি স্কুলে যদি কোনও সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছাত্র দেখতেন তাকে ঠাকুরের কাছে পাঠাতেন। এইভাবে একদিন পূর্ণচন্দ্র এসে উপস্থিত। ঠাকুর দেখেই বুঝলেন—'এই তো সেই পূর্ণচন্দ্র, মানে শুক্লপক্ষের শেষে স্বপ্নে পাওয়া ভক্ত। ঠাকুর বলতেন, 'তার ঐ নাম উপযুক্ত হয়েছে।' ঠাকুর দেখে খুব আহ্লাদিত, তাকে পরমস্নেহে উপদেশ প্রদান, জলোযোগাদি করিয়ে গাড়িভাড়া দিয়ে ফেরৎ পাঠান, বলেন, 'তোর যখনই সুবিধে হবে চলে আসবি, যাতায়াতের ভাড়া এখান থেকে দেবার ব্যবস্থা থাকবে।'

ঠাকুর সুবিধে পেলেই নানান খাদ্যদ্রব্য পূর্ণকে গোপনে পাঠিয়ে দিতেন, যাতে অভিভাবকদের চোখে না পড়ে, এবং কখনও বা অন্যত্র তাকে স্কুল থেকে ডেকে এনে দেখতেন, এমনই পোড়ামন ঠাকুরের, ভক্তর জন্য এমনই দরদ! এইভাবেই দ্বিতীয়বার পূর্ণ যখন ঠাকুরের দেখা পায়, তখন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?' আত্মহারা

কিশোর পূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর।'

ঠাকুর এ বিষয়ে পরে অন্য ভক্তদের বলেছিলেন, 'আচ্ছা পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি। সে কেমন করে এ কথা বুঝল বল দেখি? আর কেউ কেউ দিব্য সংস্কারের প্রেরণায় পূর্ণের মত ঐ প্রশ্নের ঐরকম উত্তর দিয়েছে। এটা পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।'

ঘটনাচক্রে পূর্ণচন্দ্রকে বিয়ে করে সাধারণ সংসারী জীবন যাপন করতে হয়েছিল কিন্তু তাঁর অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা, নিরভিমানিতা সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

মামা-ভাগ্নে সংবাদ

১৮৫৬ সাল থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রায় একটানা ঠাকুরের সাহচর্য পাবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর ভাগনে হৃদয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের। শ্রীমার বিবাহের ছাব্বিশ বছর পর ঠাকুর দেহরক্ষা করেন। তিনিও এতটা সময় ঠাকুরকে কাছে পান নি। শ্রীমা ছিলেন অন্তঃপুরিকা, সেবিকা, পালিকা। হৃদয় তাঁর চার বছরের বড় মামার বন্ধুর মত ছিলেন, আবার ভাবুক মাতুলটির সাংসারিক দিকটি সামলানোর ভার নিজ হাতে তুলে নেন। এসে পড়েন চাকরির সন্ধানে, থেকে যান মামার সেবায় পঁচিশ বছর। তাঁর মত একজন বলিষ্ঠ, উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য মানুষের আপ্রাণ সেবা না পেলে ঠাকুরের লীলা প্রকাশের বাধা আসতে পারে, তাই তো তাঁর আসা মায়ের ইচ্ছায়। মাতুলকে সত্যই ভালবাসত এবং তাঁর সুখের স্বাচ্ছন্দের জন্য যে কোনও রকম কষ্ট করতে হৃদয়ের কুণ্ঠা ছিল না।

হৃদয় যখন বলল সে মন্দিরের গয়না-গাঁটির ভার নেবে তখনই ঠাকুর মন্দিরের পূজক হতে সম্মত হলেন। সে দেখে রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হলে মামাটি পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে ঢোকেন। ফেরার কথা ঠাকুরের মনে থাকে না। পাছে শরীর খারাপ হয় ভেবে হৃদয় গোপনে দেখতে গেল কোথায় মামার অভিসার-ক্ষেত্র। গিয়ে দেখে মামা তার পরিধেয় বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত সব ছেড়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?' চৈতন্য লাভ করলে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তুই কি জানিস? এইরূপে পাপ-মুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাত ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই

অভিমানের চিহ্ন, ও একটা পাশ ; মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে একমনে ডাকতে হয়, তাই তো সব খুলে রেখেছি। ধ্যান করা শেষ হলে ফিরবার সময় আবার পরব।'

আসার পাঁচ বছর পর হৃদয় বিষ্ণুপূজকের পদ গ্রহণ করে। তার পাকা চাকুরি হল। সে ঘোর সংসারী। নিজ স্বার্থচেষ্টা থেকে কখনও সে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হতে পারত না। ঠাকুর যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হতেন, হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করতেন। ঠাকুরের তীর্থভ্রমণের অল্পকাল পরে হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাইতে ঘোরতর সংসারী হৃদয়েরও কিছুকালের জন্য দৈব-শক্তি ধারনের বাসনা জাগে, তাই সে মামাকে বিশেষ করে ধরে যাতে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়। সে আরও বেশী করে পূজায় ও ধ্যানে মনোনিবেশ করে এবং মামার মত মাঝে মাঝে পরিধেয় বস্ত্র, পৈতে সব ত্যাগ করে ধ্যানে বসতে লাগল। মামা তাকে বোঝান যে তার জন্য এসব নয়, সে মামার সেবা করলেই সব ফল লাভ করবে, সেইটেই তার কাজ। উভয়েই দিব্য ভাবের রাজ্যে গেলে কে তাঁকে দেখবে-এসব কথায় সে আর কর্ণপাত করে না। শেষটায় ঠাকুর বললেন, 'মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে। মা'ই আমার বুদ্ধি পালটিয়ে দিয়ে আমাকে এইরূপ অবস্থায় এনে অদ্ভুত উপলব্ধি সকল করিয়ে দিয়েছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হবে।' এর পরেই হৃদয়ের দেবদেবী দর্শন ও অর্ধবাহ্যদশা আরম্ভ হল।

একদিন রাতে মামার দরকার হতে পারে ভেবে সে তার মামার গাড়ু গামছা নিয়ে পঞ্চবটী যাচ্ছে, হঠাৎ দেখে যে ঠাকুর রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ নন, জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ ক'রে তিনি শূন্যলোকে চলেছেন। সে ভাবতে লাগল, 'আমার ভিতরে কি কোনও পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে যাতে ঐরূপ দেখছি !' সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অর্ধবাহ্যভাবাবেগে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করে বলতে লাগল, 'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নই, আমরা এখানে কেন ? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি। তুমি যা, আমিও তাই।' ঠাকুর

বললেন, 'ওরে থাম'! কিন্তু কে শোনে? শেষটায় তাড়াতাড়ি কাছে এসে তার বুক স্পর্শ করে ঠাকুর বললেন, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।' সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে মামাকে বলে, 'মামা, তুমি কেন অমন করলে?' মামা বললেন, 'আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি? তুই এখন স্থির হয়ে থাক এই—কথা বলেছি। সামান্য দর্শন লাভ করে তুই যে গোল করলি! আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি—আমি কি ঐরূপ গোল করি?'

হৃদয়ের এতে জ্ঞান হোলো না। সে আরও কৃচ্ছ্রসাধন ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবলবেগে সাধনা আরম্ভ করল। একদিন না বলে পঞ্চবটীতে গিয়ে মামার আসনে বসে ধ্যান করতে বসতে না বসতেই কাতর চীৎকারে মামাকে ডাকতে লাগল, "মামাগো পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম!' মামা ছুটে এলে হৃদয় বলল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করতে বসামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিল। অসহ্য দাহযন্ত্রণা হচ্ছে।' ঠাকুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তুই কেন এমন করিস? তোকে বলেছি আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।' এরপর তার বিশ্বাস হল যে সে সেবক, মামার সেবাই তার ঈশ্বর সেবা, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ। ঠাকুরের এই কথায় বিশ্বাস করলেও, হৃদয়ের মনে ঠিক শান্তি ফিরে এল না। সে নতুন কোনও কাজের সন্ধান করতে লাগল। এমন সময় তাকে দেশে যেতে হল তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসবের জন্য। ভারি ইচ্ছা মামাকে কাছে পায়। মামা বললেন, 'তুই দুঃখ করছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখতে যাব। আমাকে অপর কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই পাবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধার রেখে আপনমনে পূজা করিস এবং একেবারে উপবাস না করে মধ্যাহ্নে দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছরির সরবত পান করিস।' ঠাকুরের ঐ সূক্ষ্ম শরীর দর্শন হৃদয়ের হয়েছিল পূজান্তে।

হৃদয় ঠাকুরের কাছে দীর্ঘকাল থেকেও মায়ের উপর নির্ভর করতে শিখল না। নির্ভর করা কাকে বলে? যখন এটা চাই, ওটা চাই, এটা আমার ভাল, এটা আমার মন্দ—এসব বিবেচনার ভার

ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তখনই সত্যকার নির্ভর করা বলে। আমি মায়ের ছেলে, মা-ই আমার ভাবনা ভাববেন, আমি শুধু তাঁর কথাই ভাবব, আমার আবার চিন্তা কি ? চিন্তামণির নাচদুয়ারে ধর্ণা দাও, তিনি সকল চিন্তার হাত থেকে বাঁচাবেন। হয়ত শয্যা মিলবে, নিদ্রা এল না। প্রেয়সী পেলে, প্রেম পেলে না। বিষয় পেলাম, মামলায় রসাতলে গেল। কী পেলে যে আমার চলে, কিসে জীবনের সমতা আসে তা বোঝার ক্ষমতা কই আমার ? এ বিষয়ে ঠাকুরের একটি প্রিয় গান মনে পড়ছে—

'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর, মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে।
প্রভু, বিশ্ববিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোরে, মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।
আছ অনল অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে ;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।'

ঠাকুর ও শ্রীমা

ধর্মপত্নী সারদাকে ষোড়শী পূজায় মাতৃআসনে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি ধর্মপত্নীকে সঙ্গে নিয়েই ধর্মাচরণ করবেন বলে ঠিক করেছেন, কারণ স্ত্রী পুরুষে যে ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন, সাধক হলেও সে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সমর্থ হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণর ভয় কি ? তিনি তো লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কাম সবই করেছেন জয়।

ষোড়শী পূজার পরের বছর বোশেখ মাসে শ্রীমা ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু থাকবেন কোথায় ? শম্ভু মল্লিক একখানি চালাঘর তুলে দিলেন মন্দিরের কাছে মায়ের থাকার জন্য আর তার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ যোগালেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল

রাজার এক কর্মচারী যাকে ঠাকুর বলতেন কাপ্তেন। সেই চালাঘরে থেকেই ঠাকুরের গৃহস্থালী, সেবা, যত্ন, শাশুড়ীর সেবা, ভক্তদের দেখাশুনা সবই করেন মা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে থেকেই। সেই ঘরে এক রাত কাটালেন ঠাকুর শ্রীমাকে দেখতে এসে, আটকে গেলেন প্রবল বর্ষায়, নিজের ঘরে আর ফিরতে পারলেন না। সেটা তখন তাঁর কাছে চালাঘর নয়, কালীঘর। খেতে খেতে ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'এ কেমনতরো হল ? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাতে বাড়ি আসে, এ যেন আমি তেমনি এসেছি !' এই আমাদের রসিক ঠাকুর।

ভাবমুখে থেকেও ঠাকুরের জাগতিক বা সাংসারিক খুঁটিনাটির প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। একদিন ঠাকুর স্বামী যোগানন্দকে নিয়ে যাচ্ছেন বলরাম বসুর বাড়ি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো ?' যোগেন বললেন, 'না, গামছাখানা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা আপনার জন্য একখানা নতুন কাপড় দেখেশুনে দেবে এখন।' ঠাকুর বললেন, 'সে কি রে, লোকে বলবে কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে, তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—যা গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে নিয়ে আয়।' হুঁশ থাকা ছাড়াও তিনি যে জিনিসটা যেখানে রাখতেন তা সর্বদা সেখানেই রাখতেন। শ্রীমাকে একদিন বলছেন, 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে।'

দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোধ মায়ের মনে সবটুকুই ঠাকুরের শিক্ষায়, মায়ের এ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানটুকুর অসামান্য রূপ ঠাকুরের দিব্য সাহচর্যে ও নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে। শ্রীমার কেমন উল্লাস লাভ হত সে বিষয়ে তিনি বলেছেন 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে এমন সর্বদা অনুভব করতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকত তা বলে বোঝাবার নয়।' শোনা যায় শ্রীমাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার

আছে। যে ডাকবে তিনি তাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাক তো তুমিও তার দেখা পাবে।' ঠাকুর শ্রীমার সম্বন্ধে বলেছেন, 'ও যদি ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমায় আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে? বিয়ের পর ব্যাকুল হয়ে মাকে এককালে ধরেছিলাম, 'মা, আমার পত্নীর ভিতর হতে কামভাব দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্র বাস করে বুঝেছিলাম মা সে কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।'

শ্রীমা ঠাকুরকে কি চোখে দেখতেন, কি বিশ্বাস তার একটা ঘটনা বলা যেতে পারে। একদিন শ্রীমাকে পান সাজতে ও তাঁর বিছানা ঝেড়ে রাখতে বলে ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর একটু পরেই টলতে টলতে ঘরে এলেন, চোখ রাঙা রক্তবর্ণ। শ্রীমায়ের অঙ্গ ঠেলা দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' শ্রীমা তাঁর দিকে দেখে বললেন, 'না না, তুমি মদ খাবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।' ঠাকুর, 'ঠিক বলেছ' বলেই আনন্দ করতে লাগলেন।

শ্রীমা যে কতটা লজ্জাশীলা ছিলেন তা জানা যায় ভক্তদের বিবরণ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানায় থাকাকালীন ঠাকুরের দু'একজন বালক ভক্ত যাদের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীমায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তারা ছাড়া কেউই মাতাঠাকুরাণীর চরণদর্শন বা বাক্যালাপ করে নি। তিনি ছোট্ট জায়গাটুকুতে সংগোপনে থেকে দুইবেলা ঠাকুর ও ভক্তদের খাবারদাবার তৈরী করলেও, তিনিই যে করছেন এ কেউ বুঝতে পারত না। রাত তিনটের সময় শয্যাত্যাগ করতেন, তারপর শৌচ-স্নানাদি শেষ করে সাংসারিক কাজ ছাড়া সারাদিন জপ-তপে সময় কাটাতেন। এমন লজ্জাশীলা মহিলাও নির্ভয়ে যথাযথ আচরণ করবার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বিরল, তা দেখা যায় তাঁর কামারপুকুর আসার পথে ডাকাতে কালীর হাতে পড়া ও শেষটায় শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবার জন্য আগমনে—তিন মাস নানা অসুবিধায় থাকার মধ্যেও।

ডাকাতে কালীর ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীমা

একবার দক্ষিণেশ্বর আসছেন পায়ে হেঁটে। কয়েকজন সঙ্গী রয়েছেন। সন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি নামবার আগেই কোনো চটিতেই আশ্রয় নিতে হবে রাতটুকুর জন্য। শ্রীমা আর পারেন না হাঁটিতে। সঙ্গীরা যত তাড়া দেয় মা ততই পেছিয়ে পড়েন ক্লান্তিতে। শেষটায় তিনি বললেন তাদের এগিয়ে যেতে, যাতে তারা কৈকলার মাঠ নিরাপদে পার হতে পারে, তাঁর সঙ্গেও মা আছেন, তাঁর ভয় কি? বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও তারকেশ্বরের চটিতে, আমি তোমাদের পরে সেখানে ধরব। এমন সময় একজন ডাকাত, ওটা ডাকাতে কালীরই জায়গা, এসে মাকে প্রশ্ন করল, 'কে যায়?' একটুও ভীত না হয়ে শ্রীমা বললেন, 'তোমার মেয়ে গো, সারদা। দক্ষিণেশ্বরে তোমার জামাই থাকেন, সেখানে যাচ্ছিলাম, তা সঙ্গীরা আমায় ফেলে চলে গেছে। সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন।'

ডাকাত, তার স্ত্রীও ছিল সঙ্গে, তাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সেই স্বর, মধুর স্বর। যেন মধুমাখা মেয়ের কথা। তাদের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মায়ের কণ্ঠস্বর তাদের মনটিকে উসকে দিল, তারা তাদের বৃত্তি ভুলে গিয়ে প্রেমের সাগরে ডুব দিলে, রৌদ্রোজ্জ্বল মরুভূমির আকাশে যেন নম্র মেঘের মাধুর্য, চন্দ্রের চন্দ্রিমা। পিতৃস্নেহে তাঁকে নিয়ে গেল তাদের কুটীরে। স্নেহের সঙ্গে খাদ্য, শয্যা, মমতা সবটুকুই উজাড় করে দিল সেই দম্পতি। পরের দিন মাছের ঝোল ভাত খাইয়ে শ্রীমাকে তারকেশ্বর চটিতে সঙ্গীদের মাঝে সঙ্গে করে রেখে গেল। ডাকাতের মনটি ডাকাতি হয়ে গেল মায়ের স্নেহের খড়্গে। কোথায় ছিলি কাল সারা রাত জিজ্ঞাসা করলে বলেন, নির্ভয়ের আশ্রমে, বাৎসল্যের সরসীতে। নিশ্চিন্তের ক্রোড়নীড়ে।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরে বসিয়ে ঠাকুরের যে ছবিটি তোলা হয়েছিল তা একদিন ঠাকুর নিজেই ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীমাকে বললেন, 'এ এক পরম যোগীর ছবি। দেখো ঘরে ঘরে একদিন নিত্য পূজা হবে।' হচ্ছেও তাই সর্বত্র। এই ছবিটি তোলার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন আগে ঠাকুর শ্রীমার জিভে বীজ-মন্ত্র লিখে দিলেন। বললেন, 'তুমিও যা, আমিও তাই। আমরা

অভেদ। আমি যাব তুমি থাকবে।' যাবার দিন—তাও তো বলেই দিলেন আগে মাকে। যোগীনকে বললেন পাঁজি আনতে। পাঁজি এলে বললেন, 'পঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথি নক্ষত্র পড়ে শোনা তো।' যোগীন পড়তে পড়তে একত্রিশে শ্রাবণে পেঁছিলে ঠাকুর বললেন, 'আর পড়তে হবে না। বেশ রাত্রি, বেশ তিথি, ঝুলন পূর্ণিমা।'

শ্রীমা থাকতেন অন্তরালে। কিন্তু যখন ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন তিনি এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বুকভাঙ্গা আর্তনাদে, 'আমার কালীমা কোথায় গেলে গো?' বিচ্ছেদ হল বাইরে থেকে—মনের মাঝে মিলিয়ে গেলেন ঠাকুর। একবার আর্তনাদের পর জগন্মাতা একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। শোক কেন? তিনি না জননী জগদম্বা, ক্রন্দনে সন্তানের অমঙ্গল। শ্রীমা আবেগ সংবরণ করলেন।

বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। লোকাচার তাঁকেও মেনে চলতে হবে ভেবে যখন হাতের বালা দুটিও খুলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন দেহাতীত ঠাকুরকে দেহের রূপে। তিনি বলছেন, 'কেন গো, আমি কি কোথায়ও গেছি? এ তো এ ঘর আর ও ঘর।'

ঠাকুর নেই, শ্রীমাও ভাবছেন আমিও চলে যাই। এমন সময় আবার ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'জগতে মাতৃভাব প্রকাশের জন্য তোমায় রেখে গিয়েছি। তুমি থাকো। হ্যাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? তোমাকে অনেক কিছুই করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তাদের তুমি দেখো।' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে আবার বললেন, 'এ আর কি করেছে? অনেক—অনেক কাজ বাকি। দায় কি শুধু আমারই? দায় তোমারও। আমিও যা, তুমিই তাই।'

কিছুকাল পরে শ্রীমা প্রয়াগে গেছেন। মনস্থ করলেন সেখানে তাঁর ঘন কেশদাম কেটে ফেলবেন—লোকাচারমত। যেদিন যাবেন স্নানে, খুব ভোরবেলায় শুনতে পেলেন কে যেন 'লক্ষ্মী লক্ষ্মী' করে ডাকছেন দরজার বাইরে। ত্রস্তপদে দরজা খুলে দেখলেন দুটি বাহু বিস্তার করে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে যেন অভিমান, যেন কিছু বলতে চাইছেন! শ্রীমা বুঝলেন

ঠাকুরের ইচ্ছা নয় শ্রীমা কেশাংশ বিসর্জন দেন। এও সন্তানের মঙ্গলের জন্য। এই আমাদের চিরন্তনী মা।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর অসমাপ্ত ঈশ্বর মাহাত্ম্য প্রচারের কাজ করতে এগিয়ে এলেন শ্রীমা, সকলের মাঝে মাতৃস্নেহ বিতরণের জন্য।

ঠাকুরের শিক্ষা

মনে রাখা

ঠাকুর যখন গুরুবরণ করেন, তাঁদের কাছে যা তাঁর শিক্ষা সবই তাঁর ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। তিনি সবই জানতেন, গুরুরা কি বলছেন, গুণীরা কি বলছেন সেগুলি তাঁর মনমুকুরে আগেই ভেসে উঠত। মাতা জগদম্বা তাঁকে আগেই শিখিয়ে দিতেন। ঠাকুর বলছেন, 'আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্য হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলুম, 'আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও এই সব শাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। গীতার সার গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয় অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী—যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথাটি শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে। তেমন তেমন মন্তর পেলে কি হবে সব শাস্তর দিয়ে—?

'কি বা মন্ত্র দিলে গোঁসাই, কি বা তার বল ?
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিলে পাগল।'

ঠাকুর বলতেন, 'কলিযুগে হরিনাম ছাড়া পথ নেই।'

ঠাকুরের শিক্ষা সহজ, সরল আত্মসমর্পণের।

পথ কি—যত মত তত পথ। দেবতা থেকেও বড় কে—কেন. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। আমি কি--সবই তুমি। আমি বলে কিছু নেই—সব তুমি। আমার এ দেহ তোমার। দয়া কি—সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। দয়া কে করতে পারে—তিনিই। সিদ্ধ কে—পরের দুঃখে যে ঘটি ঘটি কাঁদতে শিখেছে। মাগ-ছেলের দুঃখে সবাই কাঁদে, কিন্তু অপরের জন্য ? দেহের যত্ন করবে কেন—দেহটি তাঁর জন্যই নিবেদিত, না থাকলে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করবে কি করে ? ঈশ্বর

কে—কেন মানুষ, জীবই তো শিব। জীবে সেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। জ্ঞান কি—একজনকে জানা, তাঁকে জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানার নাম অজ্ঞান। একমেবাদ্বিতীয়ম। ঈশ্বর কোথায় থাকেন—ভক্তের হৃদয়ে। বীরভক্ত কে—যে সংসারে থাকে ঈশ্বরকে ডাকবার জন্য। মায়া কি—কাম, কাঞ্চন, কামিনী। কাম ও কামিনী পরিহার কর। অবিদ্যা কি—যে বিদ্যা ঈশ্বর সাধনের সহায়ক নয়। কোথায় নিমন্ত্রণের দরকার হয় না—হরিনাম যেখানে সেখানে আহ্বান, আবাহন অপ্রয়োজনীয়। সংসার কেন ত্যাগ করবে না—'কি দরকার! সাধুদের কত কষ্ট! সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছে একজন, তার স্ত্রী বললে, কোন সুখে চলেছ ঘর ছেড়ে? এই এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, এই তো আরাম। মিছে কেন আট ঘর ঘুরে বেড়াবে?'

অহঙ্কার

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'

এই হচ্ছে ভক্তির সারকথা। আমি, আমিত্ব, অহঙ্কার সব তাঁর পদতলে বিসর্জন দিয়ে চোখের জলে তাঁর পূজা কর, তবেই শান্তি পাবে। আমি নয় তুমি। ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতেন—'এই দেহটার', 'এই খাঁচাটার', 'এই খোলটার' —এটা কার—তাঁরই লীলা প্রকাশের জন্য তাঁরই সৃষ্ট। যতদিন তিনি রাখবেন, খেলাবেন ততদিনই থাকবে। দর্প? কথায় বলে না 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'। অহঙ্কারই মানুষের পরম শত্রু। ঠাকুর বলছেন, 'যেদিন অহঙ্কার করতুম তার পরদিনই অসুখ হত।' একমাত্র অহঙ্কার-ত্যাগী ছিলেন যুধিষ্ঠির। মহাপ্রস্থানে যাবার পথে প্রথম পতন হল সহদেবের—কেন? তাঁর ধারণা ছিল তাঁর মত বিজ্ঞ আর কেউ নেই। তারপরে পড়লেন নকুল—তাঁর দর্প রূপের, তিনি নিজেকে কন্দর্পসম মনে করতেন। এবার পড়লেন অর্জুন—দুর্দান্ত ধনুর্ধর এই তাঁর অহঙ্কার। শেষটায়

পড়লেন ভীম—নিজের শক্তিকে সব সময় বড় বলে মনে করতেন—সেই দর্পে। স্বর্গে গেলেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, সত্যবাদী, ধার্মিক যুধিষ্ঠির।

ঠাকুর বলতেন, 'তুই কি কারও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার তিনি ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভাল মন্দ কি বুঝিস্? দেখবি, শুনবি, বলবি না। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। বিচার করবার যিনি তিনিই করবেন। মনে রাখিস—'যে সয়, সে রয়।'

জব্বলপুর থেকে এম. এ. পাশ, ঘোর নাস্তিক এক পণ্ডিত এসে উপস্থিত ঠাকুরের কাছে। তিনি তর্কচূড়ামণি। ঈশ্বর আছেন তেমন প্রমাণ না দেখাতে পারলে তিনি মানতে রাজী না। ঠাকুর বলছেন, 'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছু নেই, তখন নেই। কি আর করা! কিন্তু সামান্য একটু দয়া করতে পারো?' 'কি, বলুন?' বললেন সেই তার্কিক মশায়। ঠাকুর বললেন, 'একটু অনুমান করতে পারো যদি কেউ থাকে? কত কিছু রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে এটুকু তো মেনে নিতে পারো।' পণ্ডিত মশাই স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন, বললেন, 'বেশ, এইটুকু মানতে পারি অনুমানে। তারপর কি হবে?' ঠাকুর বললেন, 'তারপর তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। এই ভাবে বল, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি আঘাত দূর করে দাও। তুমি যখন বলছো নেই, তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকে, এই-টুকু বলতে আপত্তি কি?' পণ্ডিতমশায় বললেন 'না, এতে আপত্তি কি? আমি জানি ঘরে কেউ নেই। তবু ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো আমার কথা শোনো।' ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এমনি করেই প্রার্থনা। কদিন পর আবার এসো আমার কাছে।'

কদিন পরে তিনি আবার এসে উপস্থিত, এবার আর চোখে জিজ্ঞাসা নেই—সন্দেহ নেই, সমর্পণ, সম্পূর্ণ নিবেদন। বললেন, 'ঠাকুর 'যদি' আর নেই। 'কেউ'ও আর নেই। একমাত্র 'আছেন', তিনি আছেন। একজনই আছেন।' তিনি তখন রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন আশা করে।

জাতিভেদ

গদাধর জাতিভেদ মানতেন। তিনি যে ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে আসার পর। আগেই বলেছি যে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন অমন সমারোহের সময় এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি খেয়েই কাটিয়ে দিলেন পানীয় গঙ্গোদকং। গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রান্না করে খেতেন। অবশ্য বাল্যকালে দেখা গেছে কামার, বৈশ্য এদের বাড়ি যাওয়া আসা খাওয়া এ সব বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। দেশে সর্বত্রই রমণীমহলে, সর্বশ্রেণীর রমণীমহলে তাঁর আদর আপ্যায়ন গ্রহণে বাধা ছিল না। আবার গুরুবরণের পর থেকে তাঁর মন থেকে এসব সংস্কার চলে যায়, তখন তাঁর ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে সমান ভাব। তাদের সঙ্গে খেতে বা তাদের এঁটো পাতা তুলতে বাধে না। সেদিন অশ্বিনী ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে?' ঠাকুর বললেন, 'কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি। কিন্তু জাতিভেদ টেনে ছিঁড়তে যেও না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকেল গাছের বালতো আপনিই খসে পড়ে।' আবার প্রশ্ন, 'তাঁকে পাবো কি করে?' ঠাকুর বললেন, 'কাঁদতে কাঁদতে কাঁদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে তখন পাবে। চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদা মাখা। কাদা লেগে থাকলে কি করে লাগবে চুম্বকের সঙ্গে! তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে।'

কাম

একজন যুবক জিজ্ঞেস করল, 'কাম কি করে যায়?' ঠাকুর বললেন, 'একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, কমে যাবে। ওরে, ভগবান দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা হলেও বা কি? শরীর যতদিন থাকবে ততদিন একটু একটু থাকবে। তবে কি জানিস,

মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? কলিতে মনের পাপ-পাপ নয়। ওগুলো শরীরের ধর্মে আসে যায়। শুধু হরিনাম করবি আর প্রার্থনা করবি।'

মনের কাজ কি? সপ্ততীর্থে পৌঁছে যাওয়া। সত্যতীর্থ, ক্ষমাতীর্থ, দমতীর্থ, দয়াতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, তপতীর্থ আর তীর্থ প্রিয়বাদিতা। এই সপ্ততীর্থে মনটাকে নিয়ে যাও, পৌঁছে যাবে মানসতীর্থে।

পুরুষ আর প্রকৃতি অভিন্ন। দুইয়ে এক, একেরই দুই। ঠাকুর কখনও পুরুষ ও রমণীতে কোনো ভেদ করেন নি। বাল্যে বাৎসল্য, পরে মধুর ভাব। বাগবাজারের এক বড় ঘরের বধূ একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরের চরণ দর্শন উদ্দেশ্যে। এসেছিলেন সঙ্গে আর একটি মহিলা যিনি ঠাকুরের পরিচিত। তাঁরা এসে ঘরে বসলেন মেঝেতে, ঠাকুর তাঁর তক্তপোষে। ঠাকুর নেমে এসে তাঁর পরিচিত মহিলাটির পাশে বসলেন, তাতে নবাগতা কেমন লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'লজ্জা কি গো! লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। শোন, তোরাও যা আমিও তাই।' নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে এগুলো আছে বলে বুঝি লজ্জা, তাই না? যারা কৃষ্ণের দর্শন অভিলাষী তাদের আবার লজ্জা কি? তাদের তো পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সখ্য, আত্মনিবেদন। তবেই তো আলিঙ্গন।'

কাম দূর হলে ভেদবুদ্ধি থাকে না। দেখ না, যুবক শুকদেব চলেছেন ভগবৎ সন্ধানে, তাঁর চিন্তায় বিভোর, চলেছেন এক সরোবরের তীর বেয়ে যেখানে বিবসনা অপ্সরীরা স্নান করছেন, সম্পূর্ণ বিবসনা। শুকদেবকে দেখে তাদের কোনও লজ্জা নেই, কারণ শুক মায়াহীন। ছেলে সংসার ত্যাগ করে চলেছেন দেখে বৃদ্ধ পিতা ব্যাসদেব তাঁর পেছনে ছুটছেন সেই পথ দিয়ে ছেলেকে ঘরে ফেরাবার জন্য, তাঁকে দেখে ত্বরিত সুরাঙ্গনারা অঙ্গে বসন তুলে ধরল। ব্যাসদেব অবাক্। বললেন, 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? আমার যুবক পুত্র শুকদেবকে দেখে তোমাদের লজ্জা হল না আর আমি বুড়ো আমায় দেখে তোমাদের লজ্জা!'

তারা বললে, 'হবে না, তুমি বুড়ো হলেও রূপপিপাসু।' রমণীদের কটাক্ষে তাঁর চিত্তে আলোড়ন হয়।

কামিনী কাঞ্চন

'কাম তো শরীরের ধর্মে আসে যায়—শৌচ পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে কি লোকে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি আর তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এলো কি গেল সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে বাঁধ মানবে।' এই কথা বলতেন ঠাকুর।

তিনি তো কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে, সংসার ছেড়ে বনে জঙ্গলে ধ্যান করতে বলতেন না। বলতেন, 'এই গৃহকেই মন্দির বানাও আর তোমার দেহটাকে তাঁর নামে সেবায় নিয়োজিত করো।' বলছেন, 'যদি নির্জনে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে, বল বাড়িয়ে সংসার করো, কামিনী কাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না। যা আছে হেথায় তা আছে হোথায়। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধাতৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই সুবিধে। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যন্ত। দেখ না আমাকে! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়েও সংসারীর শিরোমণি। আমার তো মাগ আছে। ঘরে ঘরে ঘটিবাটি আছে। হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই। আবার হাবির মা এলেও ভাবি। ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলবে কেন?'

নারীও ভগবানেরই এক রূপের প্রকাশ। নানা রূপেই ঈশ্বর খেলা করছেন। ভগবানের নানা রূপ কেন? ঠাকুর বলছেন, 'দেখ নি ময়রার দোকানে ছানা চিনি মিশিয়ে একটা ঠাসা তৈরী করে। পরে তা থেকেই হয় গোল্লা আর বরফি, তালশাঁস আর আতাসন্দেশ। ছানা চিনির রূপান্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশে

তেমনি ভাব ভক্তির রূপান্তরে নানান রকম বিগ্রহ—শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।'

সংসারী

সংসারে পড়ে আছি, কিছু হল না। বেলা যে বয়ে যায়। কবে যে মুক্তি পাব এই কারও ভাবনা। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি জগৎটারে, তখন তারে জানি, তখন তারে চিনি' গানের মাঝেই আত্মসমর্পণ। ঠাকুর যে শুধু গান শুনতে ভালবাসেন তা নয়, নিজে গান করতেও ভালবাসেন। গান শুনতে গিয়ে গান গাইতে বসে যান, এমনই আত্মহারা ভাবুক তিনি। নীলকণ্ঠ বলছেন, 'আমায় ভাল করুন, এই সংসারে পড়ে আছি'—এখন একথা বলার সময় গানের সুর নয়, কান্নার সুর। ঠাকুর বললেন, 'পাঁচজনের জন্য তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।' যাকে দিয়ে যা করাবেন তাতেই তাঁর তুষ্টি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম। ভালো হও আর ভালবাসো। ভালো হতে পারলেই ভালবাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে। ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মানুষ, যার চৈতন্য হয়েছে সে মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁসের দলে।'

একদিন একজন ফুট কাটল ঠাকুরের সামনে কথার মাঝে, 'সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতেই বা সংসারে রাখব কেন?' ঠাকুর হেসে বললেন, 'তাকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। সংসারের জন্য যতদিন তিনি খাটান, খাটবে। তিনি যে কাজ দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো। যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে আর শুকনো কর্তব্য নয়, তবে তো পুজো। সংসার মানেই কর্তব্য সাধন। ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়। সন্তান পালন যদ্দিন সে না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তখন কি আর ঠোঁটে করে খাওয়ায় তার মা? কাছে গেলে

ঠোকরায়, কাছে আসতেই দেয় না। জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, তা ঈশ্বর ভাববেন।'

নিজের প্রতি মমতা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, পত্নীর প্রতি প্রীতি এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক নিম্নগামী প্রবৃত্তি। বাঁধ দিয়ে এই নিম্নগামী স্রোতটিকে অন্য পথে চালিয়ে দাও, আটকে দাও। ভালবাসার অঙ্কুরটি ঊর্ধ্বমুখী করে দাও। সেই চারাটি যখন মহীরুহ হবে—ছায়া দেবে তোমাকে, দেবে শান্তি।

পরীক্ষা

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুরের কথা শোনেন, মানেন না তবুও শোনেন। তাঁর পাশ্চাত্য দর্শন পড়া বৈজ্ঞানিক মন গ্রহণ করতে পারে না, ত্যাগ করতেও বাধা। তিনি ভাবলেন ঠাকুরকে পরীক্ষা করবেন যে ঠাকুরের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে যা বোঝাতে চান তা কি সত্যিই তাঁর বিশ্বাস না বুজরুকি। একদিন ঠাকুরের ঘরে এসেছেন, দেখেন ঠাকুর নেই। এই তো সুযোগ। তিনি একটা রুপোর টাকা বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলেন। ঘরের কোণে চুপটি করে বসে রইলেন ঠাকুরের প্রতীক্ষায়, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। ঠাকুর এসে সেই বিছানায় বসতে গিয়েই চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসে পড়েছেন এমনই দহন, এমনই যন্ত্রণা। সকলে ছুটে গেল, বিছানাটি ঝেড়েঝুড়ে দেখবে কি কামড়ালো, কি ব্যাপার। একটি টাকা হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেয়ে নীরবে উঠে চলে গেলেন। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন নরেনের চালাকি। 'বুঝেছি বুঝেছি' বলেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন নরেন্দ্রনাথকে, 'তুই আমায় পরীক্ষা করছিস? বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে।' কত পরীক্ষা করেছেন মথুরবাবু। বলেছেন জমিদারী লিখে দেব, ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

যোগীন একদিন মাঝরাতে দেখেন ঠাকুর ঘরে নেই। কোথায় গেলেন ঐ অনুসন্ধিৎসা জাগল তাঁর মনে। নহবতের দিকে সংগোপনে পদচালনা করলেন দেখবার জন্য যে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ তাঁর পত্নীর ঘরের দিকে গেছেন কিনা। হঠাৎ চটপট চটির আওয়াজ কানে এল, আওয়াজটি আসছে পঞ্চবটির দিক থেকে, দেখলেন ঠাকুর আসছেন। মুখখানা নিচু হয়ে গেল। ঠাকুর তো বুঝতে পেরেছেন ভক্তের মনের কথাটি, অনুচ্চারিত ভাবটি। হেসে বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবিনে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।' এই ভাবে তিনি পরীক্ষকদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেন। ভক্তই তো ভগবান। ভগবান তো দেখছেন, দেখবেনই।

বাঞ্ছাপূরণকারী

ঠাকুরের তো সব দিকেই দৃষ্টি, ছোটখাটো জিনিসও তাঁর নজর এড়ায় না। সবই তাঁর গোচরীভূত, তা চর্মচক্ষেই হোক আর মানস চক্ষেই হোক। জাহাজের খবরও তিনি রাখেন, আদার ব্যাপারীরও কথা তাও তাঁর অজানা নেই। তাঁর ছোট বড় ভেদাভেদ নেই, জাতপাতের ধারাপাত তাঁর অন্য, তিনি তো সকলেরই বাঞ্ছাপূরণকারী।

একদিন এক গরীব বৃদ্ধা লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে এসে উপস্থিত ঠাকুরের ঘরে। হাতে তার একটি ঠোঙায় দুটি সন্দেশ, ঠাকুরকে ভোগ দেবে বলে, কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছে। দুটি সন্দেশ তার কাছে বেশ দামী, তবুও তার নৈবেদ্য নিয়ে সে চলে এসেছে অপটু দেহটুকু যষ্ঠির সাহচর্যে। এসে দেখে ঠাকুরের কাছে অনেক নামী-দামী লোক। সে মায়ের কাছে উপস্থিত হল, সে দেয় নিজে হাতে করে এমন তার সাধ হলেও সাধ্য নেই ওখানে যাবার। শ্রীমা তার মনের কথাটি বুঝতে পেরে বললেন, 'আপনার সন্দেশ, আপনিই দিয়ে আসুন।' অগত্যা তাকে আসতে হল, বাধাও এল না কোনও রকম। সে অনেকের

নৈবেদ্যর মাঝে একটি কোণায় কুণ্ঠার সঙ্গে রেখে গেল তার নৈবেদ্য, হৃদয়াঞ্জলি। ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। যখন ভাব-রাজ্য থেকে জড়রাজ্যে নেমে এলেন, তার পর স্বহস্তে সমস্ত ভোগের মধ্যে থেকে সেই ঠোঙাটি তুলে তার সন্দেশ মুখে দিলেন।

একদিন রাম দত্ত এক ঝুড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছেন ঠাকুরের জন্য। তার থেকেই একটি আসবার সময় পথে একটি ভিখিরীর ছেলেকে খেতে দিয়েছিলেন। ঠাকুরকে তা দিলে তিনি খেলেন না, বললেন, 'সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগে ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়।' অথচ একদিন দেবেন একঠোঙা জিলিপি নিয়ে এসেছেন। আসবার সময় তা বোধ হয় ছোঁয়া লেগেছিল একটি মুসলমানের, আর হয়ত তার সঙ্গে কথা বলার সময় উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে তার মুখামৃতে, ভেবে দেবেন সেটা ঠাকুরকে না দিয়ে এক কোণায় রেখে দিলেন। আর ঠাকুর কিনা ঘরে এসে গুটি গুটি পায়ে সেই কোনাটিতে গিয়ে উপস্থিত, সেই ঠোঙাটি থেকেই জিলিপি খেতে আরম্ভ করলেন। কিসের স্পর্শদোষ, কে বলেছে উচ্ছিষ্ট? শুধু খেলেন তাই নয়, ঠাকুর তার থেকে সকলকে ভাগ করে খাওয়াতে লাগলেন। অন্তরের অর্ঘ্য নৈবেদ্যটিকে নিয়ে গেলেন প্রসাদে।

আর একদিন কয়েকজন ভক্তিমতী মহিলা এসেছিলেন ভোলা ময়রার দোকান থেকে একসের ভাল সর কিনে, ঠাকুরকে ভোগ দেবেন বলে। ঠাকুর সর খেতে খুব ভালবাসতেন। এসে দেখেন ঠাকুর নেই, কলকাতায় গেছেন। কাজেই তাঁদের মনস্কাম পূর্ণ হল না, তাঁরা সেটুকু রেখে গেলেন আর রামলালকে বলে গেলেন, 'ঠাকুরের তো পেট খারাপ! সবটুকু তো খেতে পারবেন না, তবুও যেন একটু খান।' রাত দশটার পর ঠাকুর কলকাতায় আহারাদি সেরে এসেই বললেন, 'ওরে রামনেলো, বড্ড খিদে পেয়েছে।' রামলাল বলল, 'সে কি, আপনি খেয়ে আসেন নি?' ঠাকুর বললেন, 'খেয়ে এলে কি হয়, আমার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে, নিদারুণ খিদে।' রামলাল সমস্ত সরটুকুই ঠাকুরের সামনে ধরল, আর ঠাকুর তার সবটুকুই খেয়ে ফেললেন। পরদিন

সকালে আবার সেই মহিলারা এলে তাঁদের বললেন, 'ওগো, রাত্তিরেই তোমার সেই সরখানি খেয়ে ফেলেছি, কোনো অসুখ করে নি।' এ এক অন্য ক্ষুধা। এই ক্ষুধা ভালবাসার জনের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য, ভক্তর ভালবাসা আস্বাদনের জন্য।

আত্মহত্যা

দেহটি কার? দেহটি তাঁর, তোমার নয়। সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য, যতদিন তিনি চাইবেন ততদিনই থাকবে। দেহটি তাঁর বীণা, তিনি বাজাবেন নানান সুরে। বীণকারই মালিক, তুমি নও। শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে শরীর সাধনা। সেই দেহ 'ঈশ্বর দর্শনের পর স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা যায়, তাতে দোষ নেই, তাকে আত্মহত্যা বলে না। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হয়ে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙ্গে ফেললে আর দোষ কি?' এই কথা বলেন ঠাকুর আড়িয়াদহের বিষ্ণুর আত্মহত্যার কথা শুনে। বিষ্ণু ধ্যানে কাঠ হয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অদর্শনে নিজের দেহটিকে অগ্নিতে বিসর্জন দিলেন, একথা শুনে ঠাকুর বলেন, 'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে ফিরে আসতে হবে পৃথিবীতে, আর জ্বলতে হবে দাবাগ্নিতে।'

হরিনাম

যদি মধু আস্বাদন করতে চাও নিরন্তর, নাম পীযূষ পান করো, হরিনাম করো। নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ আশ্রয় নেই। কাজেই হরিনাম যেখানে হবে সেখানে চল মন, বিনা আমন্ত্রণে। ঠাকুর বলছেন বলরামকে, 'তা তোমায় যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।'

ঠাকুর একদিন বিনা আমন্ত্রণে দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, কারণ সে হরিসভা। সেখানে ঠাকুর যাবেন না? ছোট বাড়ি, খুব ভীড়। ঠাকুর বসার জায়গা না পেয়ে চলে

আসতে বাধ্য হলেন। তাতেও তাঁর হাসি, আর মথুরবাবুর রাগ। মথুরবাবু রাগ করে বললেন, 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—।' ঠাকুর বললেন হাসতে হাসতে, 'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে ?'

নাম করলে কি হয় ? ঠাকুর বলছেন

'একবার হরিনাম যত পাপ হরে
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে।'

নাম করতে করতে জপ করতে করতে তাঁর দেখা মেলে। শেকলে বাঁধা কড়িকাট গঙ্গার মধ্যে ডোবানো আছে। শেকল ধরে নেমে ডুব দাও, তবেই পাবে কড়িকাট। ঠাকুর গাইছেন—

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে, আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেমরত্ন ধন।
খুঁজ, খুঁজ, খুঁজ, খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ।"

নামের মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ ব্যতিরেকে দর্শন সম্ভব নয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম করতে হবে আর সঙ্গে রইবে প্রার্থনা—হে ঈশ্বর আমায় অনুরাগ দাও, বীতরাগ দাও দেহ-সুখ, মান-যশের উপর।

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কথা বোঝা বেশ কঠিন। সংসারী লোক যাতে হরিনামের দিকে ঝোঁকে তাইতে গৌর নিতাই শেখালেন 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল।' সংসারী লোকেরা ভাবল বড় মজা, যুবতী মেয়ের কোলে বসে যদি মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া যায় তাহলে না হয় একটু হরিনাম করাই যাক। প্রথম দুটি ভোগ মনোরম, পরেরটি না হয় দুর্ভোগই হোক! মাগুর মাছের ঝোল মানে প্রেমের অশ্রুনির্ঝর, যুবতী মেয়ে মানে ধরিত্রী। মেয়ের কোল মানে হরিনামে ধুলোয় গড়াগড়ি। একবার নাও না মধুমাখা হরিনাম কণ্ঠে, দেখ না অশ্রুসাগরে ধুলোয় গড়াগড়ি হয় কিনা!

শোকতাড়না

ভক্ত মণিমোহন মল্লিক তাঁর এক উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুর পর ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত সংকারান্তে। চুপচাপ বসে আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিগো, আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?' মণিমোহন ঘটনাটি নিবেদন করলেন। মণিমোহন বলছেন, ঠাকুর শুনছেন। শুনতে শুনতে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে হঠাৎ গান ধরলেন

'জীব সাজ সমরে
ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্যরথে ভজনসাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।'

পরে বলছেন, 'তবে কি জান? যারা তাঁকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আঁধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি গঙ্গায় স্টীমার-গুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনোখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু'চারবার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দু'চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

শ্রীমা সেদিন খোঁজ করছেন মাঝি-বউয়ের। বলতে বলতেই সে এসে উপস্থিত। তার শুকনো মুখখানি দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ তোমার কি হয়েছে মাঝি বউ?' সে বললে, 'মাগো, আমার জোয়ান রোজগেরে ছেলেটি মারা গেছে।' মা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সে কি কান্না, আকুল ক্রন্দন। মাঝি-বউয়ের শোক মিলিয়ে গেল। তারপর মা মাঝি-বউয়ের মাথায় খানিকটা তেল ঢেলে দিলেন, কিছু খেতে দিলেন আর সস্নেহে বললেন, 'আবার আসিস মাঝি-বউ।' শ্রীমা শোকটুকু শুষে নিলেন স্নেহামৃত বর্ষণ করে, ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দিলেন।

প্রিয় কন্যার শ্মশানে দাহের পর জননী উবিবরী অঘোরে কাঁদছেন। সেই ধ্বনি প্রবেশিল ভগবান বুদ্ধের কানে, তিনি তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাগো, তুমি কাঁদছ কেন?' জননী বললেন, 'এখানে আমার মেয়েটিকে ছাই করে দিয়েছি।' বুদ্ধদেব বললেন, 'চুরাশী হাজার মেয়ে এই চিতার ভস্মে ঘুমিয়ে রয়েছে। তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্য, কোন মেয়েটির জন্য কাঁদছ? কত তো কাঁদলে জন্ম জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে? যদি চুরাশী হাজার মেয়ে চিতাশয্যা ছেড়ে ওঠে আসে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে? পথিক যেমন পথ চলতে চলতে তরুতলে আশ্রয় নেয়, তেমনি তারা তোমার অঙ্কছায়ার আশ্রয় নিয়েছিল। ক্ষণমুগ্ধ ভেবেছিলে, ওদের উপর তোমার বুঝি শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরস্থায়ী। শ্মশান নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শুধু এক বস্তু সার জেনো—সে হচ্ছে যাত্রা, অনন্ত যাত্রা, তোমার মেয়েরও তেমনি।' এও ঠাকুরের মত দুঃখ ঠেলে দেওয়া, শুষে নেওয়া নয়।'

ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী

'রোগ সারিয়ে দাও', 'শান্তি দাও', 'ভক্তি দাও' এমন সব আব্দার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেশির ভাগ মানুষের আগমন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু নিজে হবে, সারিয়ে দেব, শান্তি পাবে এমন কথা বলতেন না, বলতেন 'মাকে ডাক্', 'মার ইচ্ছে হলে হবে' 'আমি কি করতে পারি'। নিজের রোগমুক্তি নিয়েও সেই 'মায়ের ইচ্ছা'। কখনও বা স্পষ্ট বলে দিতেন—'হবে না', 'পারব না', তবে এমন বচন বড়ই কম। তাঁর সেই গান—'সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'। এরকম সত্ত্বেও ঠাকুরও তিনবার দুঃখের ভবিষ্যৎবাণী করে ফেলেছিলেন তাঁর পরিবারের তিনজনের সম্বন্ধে।

লক্ষ্মীমণি বিবাহের পর তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর সন্দর্শনে এসে পড়েছেন। তাঁদের দেখে ঠাকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—

‘ও যা ঃ ও তো বিধবা হবে।’ সকলেই স্তম্ভিত। শ্রীমা বললেন, ‘এ সব কি কথা বলছ গো ?’ ঠাকুর জবাব দিলেন, ‘কি করব, মা বলালেন !’ সত্যই লক্ষ্মীমণি শ্রীমায়ের সেবায় জীবনটা কাটিয়ে গেলেন, নিজের সংসার করা হল না।

ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় ঠাকুরের ও পরিবারবর্গের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজক ছিলেন। বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অক্ষয় শ্বশুর-বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে ঠাকুর হৃদুকে বলেছিলেন, ‘হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ। রাক্ষসগণ-বিশিষ্টা কোনও কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। ছোঁড়া মারা যাবে দেখছি।’ হৃদয় বললেন, ‘ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়ে অমন কথা কেন বেরুল ?’ ঠাকুর বললেন, ‘আমি কি ইচ্ছা করে বলেছি ? মা যেমন জানান ও বলান, ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে তেমনি বলতে হয়। আমার কি ইচ্ছা যে অক্ষয় মারা পড়ে ?’

অগ্রজ রামেশ্বর একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুর যাচ্ছেন শুনে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, ‘বাড়ি যাচ্ছ যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকট শোবে না, তাহলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।’ বাড়ি পৌঁছানোর পর তাঁর অসুখ হয়েছে শুনে ঠাকুর হৃদয়কে বলেছিলেন, ‘সে নিষেধ শোনে নি, তার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।’ তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঠাকুর নিজে নহবতে জননী চন্দ্রমণিকে সংবাদ দিতে গেলেন। এ বিষয়ে ঠাকুর বলেছেন, “ভেবেছিলাম মা ঐ কথা শুনে একেবারে হতজ্ঞান হবেন এবং তাঁর প্রাণরক্ষা সংশয় হ’বে। কিন্তু ফলে দেখলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত হল। মা ঐ কথা শুনে অলপস্বলপ দুঃখ প্রকাশ করে ‘সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব শোক করা বৃথা’ ইত্যাদি বলে আমাকেই শান্ত করতে লাগলেন। দেখলাম তানপুরার কান টিপে যেমন সুর চড়িয়ে দেয়, শ্রী শ্রী জগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উঁচু গ্রামে চড়িয়ে রেখেছেন, পার্থিব শোকদুঃখ ঐজন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। ঐরূপ দেখে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করলাম এবং নিশ্চিন্ত হলাম।’

মণিমোহন জিজ্ঞাসা করছেন, 'আচ্ছা ধ্যানের কি নিয়ম ? কোথায় ধ্যান করবো ?' ঠাকুর বললেন, 'কেন, হৃদয়ে। হৃদয়ই ডঙ্কাপেটা জায়গা। নয়তো সহস্রারে। এ সব বৈধী ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। তাকে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় কপালে। জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা। আর সাকার ধ্যান ? তাকে বলে বিষ্ণুযোগ। দৃষ্টি নাসাগ্রে। অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে।'

জ্ঞানীর লক্ষণ কি ? ঠাকুর বললেন, 'লক্ষণ দুটি। প্রথম অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয় স্বভাবটি শান্ত হবে। যার মধ্যে এ দুটো লক্ষণ দেখবে, জানবে তার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ।'

নন্দ বোস জিজ্ঞাসা করছেন, 'ভোগান্ত না হলে কি চৈতন্য হয় ?' ঠাকুর বললেন, 'ওরকম মত আছে বটে। কাদের মত জানো ? যাদের ভোগ করার ইচ্ছা তাদের। আহা, ভোগ করবে কি ? ঐ তো আমড়া, আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্লশূল। চৈতন্য হয় একমাত্র তাঁর কৃপায়।' নন্দ প্রশ্ন করলেন, 'আর তাঁর ইচ্ছেতেই আমরা মরছি।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তোমরা কোথায় ? সব তিনি। তিনিই মরছেন, তিনিই হয়েছেন। তুমি তাঁর ভালবাসার জন, এ যদি একবার তাঁকে বোঝাতে পারো, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন।'

বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য আনন্দকে পাবার জন্য মাতঙ্গী প্রায় পাগলিনী। তথাগত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওর দেহের কোন অংশকে ভালোবাসো ? মাতঙ্গী বললে, 'চোখ, কান, নাক, মুখ, চলন বলন সমস্ত।' তথাগত বললেন, 'চোখে, কানে, নাকে, মুখে দেহের প্রতি অংশেই ঘৃণিত মল। ক্লেদে কলুষে মানুষের জন্ম, ক্লেদে কলুষেই মানুষের মৃত্যু। কাকে তুমি ভালবাসছ ? ঐ নশ্বর দেহটিকে ? যার অস্তিত্বেও দুঃখ, অবমানেও দুঃখ ? সত্যি যদি আনন্দ চাও, এমন আনন্দের সন্ধান করো যার লয় ক্ষয় ব্যয় নেই। সুখের আকাঙ্ক্ষা বর্জন না করলে দুঃখ দূর হয় না। সংসারে যারা দুঃখ পায়, সুখের ইচ্ছেতেই সে দুঃখ পায়। আর যারা সুখী হয়, পরের সুখেচ্ছাতেই সুখী হয়। সুতরাং 'আমি'-

কে দান করো। নিজের আর পরের উভয়ের দুঃখ দূর করার জন্য উৎসর্গ করো 'আমি'কে !'

ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'ভিক্ষা দাও।' ব্রাহ্মণ তিরস্কার করে বললেন, 'ফিরে যাও ঘরে। চাষ করো জমি, বীজ বোনো, পরিশ্রমের ফসল ফলাও।' ভগবান বললেন, 'আমিও জমি চাষ করি বৈকি ! আমি বীজ বুনি। মানবজীবনই আমার ভূমি। বীর্য বৃষ, বিনয় হাল, প্রজ্ঞা ফাল। সৎকর্মের বৃষ্টিতে ভূমি উর্বর হয়, তারপর সম্যক দৃষ্টির বীজ বুনি। কর্ষণে কর্ষণে যে জঞ্জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার নাম তৃষ্ণা। তারপরে ভূমি ফল দেয়। আর সেই ফলের নাম নির্বাণ।'

কায়, মন বাক্য,—এই তিনটি ধনের সংহতি আনে সাধনার পথে অগ্রগতি। ঠাকুর লাটুকে বলছেন, 'সেবা বস্তুতে নয়। সেবা অন্তরের দৃষ্টিতে। ভিক্ষা করে এনেও যদি প্রিয় জিনিস কেউ ভগবানকে দেয় সে সেবাও উত্তম জানবি।' শ্রীমাও ঠিক এই কথা বলেছেন, 'জিনিসের বিচার হবে কি জিনিসের দাম দিয়ে ? কখনো না। তার দাম হবে যে দিচ্ছে তার আন্তরিকতা দিয়ে।' 'যা কিছু মোর দান, গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান, আপন হৃদয় দিয়ে।' নিজের পছন্দমত জিনিস দিয়েই দেবসেবাকেই বলে আত্মবৎ সেবা। দেবতা বোঝেন ভক্তের অন্তরের আকূতি।

শশধর জিজ্ঞেস করছেন, 'কিরূপ ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায় ?' ঠাকুর জবাব দিলেন, 'আমার বাপু জ্বলন্ত ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিন রকম। সাত্ত্বিক—সব সময়ে নিজেকে গোপনে রাখে। রাজসিক—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে পূজা, গরদ পরে বসে ঠাকুরঘরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তো, মাঝে মাঝে আবার একটা করে সোনার রুদ্রাক্ষ। আর তামসিক ? যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি। মনে খুব জোর, খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ ?' এই তমোগুণেই ঈশ্বর লাভ, জোর করো, রোক করো, ভালমন্দ সব তাঁকে অর্পণ—করো তারপরেই পাবে তাঁকে।

মহাপ্রয়াণ

রোগ কেন ?

মাস্টারমশাই বলছেন, 'বড় গরম পড়েছে।' ঠাকুর বললেন, 'একটু বরফ খেয়ো। গরমে আমারও বাপু কষ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি? এই দেখ না কুলপি বরফ একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।' অসুখের এই সূত্রপাত।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ঠাকুরের অসুখের তিনটি কারণ। প্রথম কারণ অপরের, ভক্তের পাপ গ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বলেন, 'গিরিশের পাপ। ও যে কষ্টভোগ করতে পারবে না।' একদিন এক কুষ্ঠরোগী এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ঠাকুরের কাছে, বললে, 'দয়া করে যদি একবার হাত বুলিয়ে দেন সেরে যাই।' ঠাকুর বললেন, 'কই আমি তো জানি না কিছু, যখন বলছ দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। মার ইচ্ছে হয় তো সেরে যাবে।' দেবার পর হাতে সে কি অসম্ভব যন্ত্রণা। ঠাকুর আকুল হয়ে মাকে বললেন, মা, এমন কাজ আর করব না। ঠাকুর বলছেন, 'রোগীর রোগ সেরে গেল। মা দেখিয়ে দিলেন যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়।' তখন তাদের দুষ্কর্মের বোঝা নেন ঘাড় পেতে। সেই জন্যই এই রোগ। সকলের রোগ নিজের দেহে টেনে নিয়ে অপরকে সাহায্য করা। অপরের জন্য তবুও বলা যায়। কিন্তু নিজের জন্য? তাই কি হয়?

সেদিন শশধর তর্কচূড়ামণি বলছেন, 'আপনার মত যারা মহাপুরুষ তাঁরা ইচ্ছা করলেই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারেন। দেখুন না চেষ্টা করে।' ঠাকুর প্রতিবাদ করলেন, বললেন, 'তুমি এত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে এমন করে বললে? যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়মাসের খাঁচার উপর দেব? এটা তুমি কেমন কথা বললে গো?'

ঠাকুর সিদ্ধাই এর-বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলতেন যে

তাতে শক্তিক্ষয় হয়। করতে চাইতেন না। একবার তো মথুর বাবুর স্ত্রীর অসুখ সারিয়ে দিয়ে নিজে ছ' মাস ভুগলেন।

রোগের দ্বিতীয় কারণ, সমস্ত ভক্তদের একসূত্রে গেঁথে দেওয়া, একত্র সংহত করা। সূত্রটি কি? সেবা। সেবা কার? জীবের নয়, শিবের! শুধু তাঁর একার সেবা নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা সমস্ত মানব কল্যাণের। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মহাভারতে ভীষ্মের কথা মনে করুন 'ন মানুষাং শ্রেষ্ঠতরং হে কিঞ্চিৎ।' মানবসেবাই মাধবসেবা।

তৃতীয় কারণ, তর্কাতীতের জয়, অজানার জয়, বিজ্ঞানের পরাজয়। বড় বড় চিকিৎসাবিদ্, বিজ্ঞানী আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখল, বিজ্ঞানের উপরে বিধাতা।

কবিরাজের দল আসতে লাগল। এ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররাও আসছে, রোগ বেড়েই চলেছে। ডাক্তাররা বলে ক্যান্সার, কবিরাজেরা বলে রোহিণী। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন 'শাস্ত্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান, কিন্তু আরোগ্য অসাধ্য।' শেষটায় এলেন হোমিওপ্যাথি করাতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

ব্যথা বেড়েছে। গলায় প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে ডাক্তাররা। ভক্তরা কড়া পাহারায় রেখেছে দর্শনার্থীদের, দেখা যদিও বা কাউকে করতে দেয়, কথা কইতে মানা। যেন মুক্ত হরিণকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ঠাকুর করুণভাবে বললেন, 'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলবে কি করে? কত লোক কত দূর থেকে আসছে, একটি কথাও শুনে যাবে না?' একজন ভক্ত বললে, 'কি দরকার? আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছু নেই? তোর তো দেখে আনন্দ, কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে!'

সন্তানসেবা

রোগশয্যায় শুয়েও নিরন্তর সন্তানদের জন্য ঠাকুরের উৎকণ্ঠা, উপদেশ। মনশ্চক্ষে সব দেখতে পান। একদিন অমনি টের পেলেন যে লাটু, রাখাল, নরেন্দ্র এরা শেষরাতে বাগানে গিয়ে খেজুররস

চুরি করে খাবেন যে গাছটির, তার নীচে একটি কালসাপ আছে। সেখানে গেলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। চুপি চুপি রোগশয্যা ছেড়ে অন্ধকারে যোগবলে সেই বৃক্ষ ও সর্প দু-ই-ই উধাও করে দিয়ে আবার গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়লেন। শ্রীমা দেখতে পেয়ে গেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটেছিলে কোথায় ?' ঠাকুর বললেন, 'তুমি দেখেছ বুঝি ? তুমি যেন এই কথা কাউকে বোলো না।' বলে সব ব্যাপারটা বললেন শ্রীমাকে।

কল্পতরু

ঠাকুরের গলার কষ্টটুকুর লাঘব হচ্ছে না। ভক্ত সন্ন্যাসীরা সকলেই বিষাদগ্রস্ত। কিন্তু যিনি সেই কষ্ট বহন করছেন তিনি সদা হাস্যময়, জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁর

'অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।'

এই দেহটি তো তাঁরই হাতের বীণা, হাতের লেখনী, যেমন খুসি, যতদিন প্রয়োজন ততদিনই বাজাও। লেখ তারপর ছুঁড়ে ফেলে দাও লেখনী দূরে দূরান্তরে অন্ধকারে। জ্বলতে জ্বলতে মিশে যাবে তা অনির্বাণজ্যোতিতে। ঠাকুর বলেন, 'সুখ দুঃখ রোগ শোক জন্ম মৃত্যু এসব দেহের, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর ঈশ্বর হয়ত ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো আধারে।'

মেডিকেল কলেজের ইংরেজ ডাক্তার কোটস একদিন ঠাকুরকে দেখতে এসে বললেন, ক্যানসার রোগ। রোগীকে দেখলেন যীশুর মত শুচি, স্নেহ, জ্যোতির্ময় পুরুষকে। ভাবসমাধি কথাটি বাইবেলে পড়েছেন, সেদিন চোখে দেখলেন ভাবসমাধি কাকে বলে। ফি নিলেন না, বললেন, 'টাকা ছুঁয়ে হাত ও মন অশুচি করতে পারব না।'

১লা জানুয়ারী ১৮৮৬ তারিখে ঠাকুর কল্পতরু হলেন। ভক্তরা কাশীপুরের বাড়ির বাগানে সমবেত হয়েছে ঠাকুরের দর্শন পাবে এই আশায়। ছুটির দিন, একটু আগেই এসেছে। না হয় অপেক্ষাই করতে হবে একটু, ক্ষতি কি? সারাজীবনই তো প্রতীক্ষা, অপেক্ষা করে থাকা। এই মাটির ঘর বা অট্টালিকা কি আমাদের আশ্রয় হতে পারে? এ তো দুদিনের আশ্রয়, দুদিনের আশ্রয় তার পদাশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে যেদিন সংসারে আগমন সেদিন থেকেই অনিকেত আমরা। ডাক এলেই ছেড়ে চলে যেতে হবে, 'কথাটি নাহি বলে'। তখন বাড়ি মেরামত বাকি, তালা-চাবিটা খুঁজে দেখি—এসব অজুহাতে নিরাশ্রয় থেকে আশ্রয়পথে যাত্রা থেমে থাকবে না। এই যে আমার বাড়ি তা কি আমার? এ যেন বৃষ্টিটা থামবার জন্য সাময়িক ছাতার তলায় দাঁড়ানো। বরষা থেমে গেলে আবার চলা। পথের চেয়ে অপেক্ষা বড়। এ বাড়িটা তো স্টেশনের পান্থশালা! ভক্তেরা অপেক্ষমান, ভগবান তো চলমান।

ভগবানের কি শোবার সময় আছে? ভক্তেরা যে বসে আছে, দেখা দিতে হবে। চললেন সেজেগুজে সবুজ বনাতের জামা, লালপেড়ে ধুতি, চটিজুতো, মোজা এমন কি কানঢাকা কাপড়ের টুপিটিও বাদ গেল না। নিখুঁত পোশাকে ডাক্তারী বিধিনিষেধ, কঠিন পাহারাওয়ালা, দেহরক্ষী সকলকে ফাঁকি দিয়ে এলেন নেমে দোতলা থেকে বাগানে ভক্তদের মাঝখানে। ভক্তরা তো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রয়েছে দোতলার ঘরের দিকে একটু দূর থেকে দেখবে বলে। আর তিনি কিনা ধরাছোঁয়ার সামনে দাঁড়িয়ে, সে সময়ে তাঁর একটিও সন্ন্যাসী ভক্ত ছিল না কাছে। চারিদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল, প্রণাম, পুষ্পাঞ্জলি, স্পর্শ যে যার মনোমত করে সাধ মেটাল, শেষবারের মত। স্পর্শেই তো চৈতন্য সঞ্চারণ, ভক্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহ। করুণাময় যেন বলছেন সমবেত ভক্তদের, ওরে তোরা আয়, যা চাইবার চেয়ে নে, সব পাবি।

গিরিশের কাছে গিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ?' একটুও বিচলিত না হয়ে ঠাকুরের পদপ্রান্তে জানু-

সংলগ্ন করে যুক্তহস্তে বললেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?' ঠাকুর মুগ্ধ হলেন গিরিশের সরল বিশ্বাসে এবং সমবেত ভক্তদের বললেন, 'তোমাদের আর কি বলব? আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।' এরপর ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। সকলে একে একে এসে প্রণাম করতে লাগল। তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে স্পর্শোদ্ধার করলেন।

চুনীলাল বসুর আসতে দেরি হয়ে গেছে। সে কি আর পাদস্পর্শ করতে পারবে না, বর চাইতে পাবে না? ঠাকুর তার মনের কথাটি বুঝতে পারলেন। দ্বারী নিরঞ্জন কি যেন একটা কাজে অন্যত্র গেছেন দেখে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন, বললেন, 'আজ যা বুঝলাম ঠাকুরের শরীর বেশিদিন থাকবে না। এইবেলা যা চাইবার চেয়ে নিন।' চুনীলাল ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন, 'আসতে দেরি হল বুঝি? তুমি কিছু চাও।' তিনি আর চাইবেন কি, ঠাকুরের শ্রীপাদস্পর্শেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেল। ভাব তার পেল না ভাষা, হারিয়ে গেল ঠাকুরের স্পর্শে। তিনি শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। ঠাকুর হসলেন। তারপর চুনীলালের দেহের দিকে সংকেত করে বললেন, 'শুধু তোর হবে না, সকলেরই হবে।'

ঐ দিনটিতে বৈকুণ্ঠনাথও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, 'আমায় কৃপা করুন।' ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হয়ে গিয়েছে।' তথাপি বৈকুণ্ঠনাথ বললেন, 'যাতে তা অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তাই করে দিন।' ঠাকুর ক্ষণেকের জন্য তাঁর বক্ষস্থল স্পর্শ করতেই বৈকুণ্ঠনাথ ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সর্বত্রই ঠাকুরকে দেখতে লাগলেন, সমস্ত বস্তুর মাঝে হাস্যদীপ্ত প্রসন্ন ঠাকুরকে। সব কাজ মাথায় উঠে গেল। সে দর্শন আর বন্ধ করতে পারেন না। শেষটায় কদিন পর সেই ভাবধারণ যখন কষ্টসাধ্য বোধ হল তখন ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমি এই ভাবধারণ করতে পারছি না। যাতে এর উপশম হয় তাই করে দাও।' এই প্রার্থনার পর ঐ ভাবের

অবিরাম প্রবাহের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল, শুধু দিনের মাঝে কয়েকবার ঐ মূর্তির দর্শন পেতেন।

প্রায়শ্চিত্ত

মানবদেহ যখন ধারণ করেছেন তখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঠাকুর তাই রামলালকে ডেকে বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী বলবে প্রায়শ্চিত্ত করলে না। তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা কালীকে নিবেদন করে বামুনটামুনদের বিলিয়ে দে।' রামলাল ছুটল ঠাকুরের আদেশ পালন করতে।

সংকেত

যাবার সময় আগত বুঝে শ্রীমাকে ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার ইষ্টকবচ তুমি নাও। তোমার কাছে রেখে দাও।' শ্রীমার অন্তর হাহাকার করে উঠল। তিনি বললেন, 'না না, তোমার কবচ তোমার কাছেই থাক।' কথা শেষ করার আগেই ঠাকুর সে কবচ খুলে ফেলেছেন। শ্রীমার হাতে তুলে দিলেন সেই ইষ্টকবচ মহাপ্রস্থানের পূর্বে।

এল সেই মহাদিন। মহানিষ্ক্রমণের দিন ১২৯৩ সালের শ্রাবণ সংক্রান্তি, ঝুলন পূর্ণিমা। রোদঝলমলে উজ্জ্বল আকাশ। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। কোথায় একটা বাজ পড়ল। এ কি অলক্ষণ! শ্রীমা ছুটে গেলেন ঠাকুরের ঘরে। দেখে ঠাকুর বললেন, 'ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি? রাম অবতারে লীলা অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং এসেছিলেন। এবার বজ্রধর নিজে সংকেত করে গেলেন, দিন আর নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।' শ্রীমার পাশে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আঁচলে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলে ঠাকুর বললেন, 'কিসের দুঃখ, কিসের শোক! এখানকার কত কথাই তো শুনলি। সেই সব কথা বলবি সবাইকে। সে তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রঘুবীর

আছে, তাকে নিয়ে থাকবি। আর কতোদিনের জন্যই বা এই তিরোধান—মোট দুশো বছর। দুশো বছর পরে আবার আসব।'

সব অলক্ষুণে ব্যাপারগুলি ঘটছে। ছাদে কাপড় শুকোতে দিয়েছিলেন শ্রীমা। বিকেলে তুলতে গিয়ে আর পেলেন না। জলের কুঁজোটা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সন্তানদের জন্য খিচুড়ি রেঁধেছেন, ধরে গেল তার তলাটা। সন্তানদের ভালটুকু দিয়ে ধরাটুকু নিজে খেলেন। সব অবতারদের বিশেষ প্রিয় ভোজ্য থাকে, যেমন বুদ্ধদেবের ফেনী বাতাসা, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীর, সর, রঘুনাথের রাজভোগ, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'খেচরান্ন' মানে খিচুড়ি আর নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাভোগ। শঙ্করপন্থীদের পুরি নাড়ু।

তিরোভাব

১৫ই অগস্ট, ১৮৮৬। এ জীবনের শেষ দিনটি। সারাদিনই ঠাকুর ভাবাচ্ছন্ন, ঘন ঘন সমাধি হচ্ছে। কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। বিকেলের দিকে শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। ডাক্তার এলেন, নাড়ী দেখে বললেন, 'আলো নিভৃতে আর দেরি নেই।' ঠাকুর যেন ভিনদেশের কারও সাথে নীরবে কথাবার্তা বলছেন। এমনি কথাবার্তা, খাওয়া সবই বন্ধ। সন্ধ্যের দিকে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এলে চোখ খুলে ভক্তদের বললেন, 'সারাদিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাই তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।' তাড়াতাড়ি তরল পথ্য এলো। কিন্তু ঠাকুর খেতে পারলেন না। 'হরি ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করে ঠাকুর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঘণ্টাখানেক পরে প্রায় একটার সময় আবার জ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভাতের পায়েস খাব।' পায়েস এলে বললেন, 'বসে খাব।' তাঁকে ধরাধরি করে বসিয়ে দেওয়া হল। এত স্বাভাবিক ভাবে আয়াস করে খেলেন যেন গলায় কোনও কষ্ট নেই। খেতে খেতে বললেন, 'এত খিদে যে ইচ্ছে হচ্ছে

হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই।' সেইদিন ঠাকুর ছাড়া আর সকলে তাই-ই খেয়েছে। ঠাকুর তো আগেই বলেছেন মাকে যে, 'শেষ-কালে আর কিছুই খাব না, কেবল পায়েস খাব।' পায়েস খেয়ে খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন। তারপর দু'হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কালী, কালী, কালী', তারপর শুয়ে পড়লেন শেষ শয্যায়। ১৬ই অগস্ট, রাত একটা বেজে দুমিনিট। ঠাকুরের সারাদেহ কেঁপে উঠল দু'একবার, গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠল। চাহনি এসে নাসাগ্রে স্থির হল, ঠাকুর চলে গেলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল দিব্যজ্যোতি।

বিকেল পাঁচটায় শোভাযাত্রা শুরু হল। তারপর গঙ্গাতীরে দেহাবসান। দুশো বছর পরে পুনরায় আবির্ভাব হবেন সেই আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা (ঠাকুরের কথায় তিনি 'সরকারী লোক।' তাঁকে জগদম্বার জমিদারীর যখনই যেখানে কোনও গোলমাল উপস্থিত হবে সেখানেই তখন গোল থামাতে ছুটতে হবে।)' আর গাওয়া—

"যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেও না, প্রভু।
যদি কোনদিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে
ফিরিয়া যেও না, প্রভু।
যদি কোনদিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে
ফিরিয়া যেও না, প্রভু।
যদি কোনদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চিরদিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেও না, প্রভু।"